সমুদ্রতীর

সমুদ্রতীর

বুদ্ধদেব বসু

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড



রচনাকাল : ১৯৩৬-৩৭
প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৭

নিউ এজ সংস্করণ : ১৯৫৩
(লেখককর্তৃক পরিমার্জিত)

প্রকাশক
জে, এন, সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড
২২, ক্যানিং স্ট্রীট,
কলিকাতা-১

মুদ্রক
শ্রীরণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১২

দাম দেড় টাকা

উৎসর্গ

শ্রী দিলীপকুমার রায়

কলকাতায় নয় কেন ?

সত্যি কথা, ছুটি হ'লেই কি ঘর থেকে বেরোতে হবে? ছুটি কি ঘরে ব'সে কাটাতে নেই? আমার তো এক-এক সময় মনে হয় ছুটিটা চুপচাপ বাড়ি ব'সেই কাটানো ভালো। কেননা ঠিক নিজের ইচ্ছেমতো কাটাতে পারি এমন সময় আজকালকার এই বাণিজ্যজগৎ আমাদেব মোটে দেয়ই না। বছরের বেশির ভাগ সময় আমরা সকলেই মারাত্মকরকম ব্যস্ত। 'সময় নেই, কাজ আছে', এই হচ্ছে আজকালকার জটিল বিস্তৃত সভ্যজীবনের হৃৎপিণ্ডের সুর। সময় নেই, কাজ আছে। অনেক প্রিয় জিনিশ আমরা তাই কেবলই ঠেলে-ঠেলে রাখি ছুটির আশায়। কত বই পড়তে ইচ্ছে করে, পড়া হয় না। কত রকমের খামখেয়ালি লেখা লিখতে ইচ্ছে করে, লেখা হয় না। তা ছাড়া, নিছক কুড়েমি করাটাও কম কথা কী। খামকা শুয়ে-শুয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকার অধিকারও মানুষের আছে, সে-অধিকার অতি পবিত্র, তাকে একেবারে হারালে চলবে না। ছুটি আসে এই সমস্ত আশা নিয়ে। কত অলস ভাবনার আলো-ছায়া, কত চুপ ক'রে থাকা, কত ভালো লাগা। ছুটিতে বাড়ি ব'সে ইচ্ছেমতো বই পড়া, ইচ্ছেমতো একটু লেখা, ইচ্ছেমতো কিছু না-করা—আমি তো ভাবতে পারি না এর চেয়ে সুখের কী হ'তে পারে। কিন্তু তা তো নয়: মালপত্র বেঁধে নিয়ে আমরা রেলগাড়িতে চেপে বসি, কোনো-এক স্টেশনে নেমে বাঁধাছাঁদা খুলে ক্ষণিক ঘব বাঁধি; তারপর আবার বেঁধে-ছেঁদে চ'ড়ে বসি ফিরতি

গাড়িতে; ফিরে এসে ছুটির যে-ক'টা দিন বাকি থাকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাটাই যেখানে গিয়েছিলুম সে-দেশের কথা ভেবে।

'আমরা' বললুম; আসল কথাটা 'আমি'। সব সময়ই তা-ই নয় কি? যখন সাহিত্য কি নীতি কি জীবনের কোনো তত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসি, তখন খুব গম্ভীরভাবে আমরা-আমরা বললেও কথাগুলো আমারই, বিশেষ, নির্দিষ্ট এবং বিবিধ ব্যক্তিগত সীমায় পরিমিত একজন মাত্র মানুষেরই। আমারই কথা এটা যে ছুটিতে বাড়ি ব'সে কাটানোই সবচেয়ে ভালো; আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে রেলগাড়িতে চেপে বসাটাও আমারই কাজ। ছুটি যতই কাছে আসে মনের মধ্যে একটা গান বেজে উঠতে থাকে: চলো, চলো। কোথায়? যেখানেই হোক, চলো। কত পাহাড় কত প্রান্তর কত অরণ্য কত সমুদ্রের ঢেউ, কত নির্জনতা কত আশ্চর্য রাত্রি। যেখানেই যাও, পৃথিবী অপরূপ হ'য়ে আছে জ্বলন্ত তারায় আর অন্ধকারে—কত দূর সেখান থেকে এই কলকাতা, কলকাতার মৃত আকাশ, আর ধূসর দিন-রাত্রি, কত দূর কলকাতার শ্বেত-ধূসর সব মুখ।

চলো তো বললুম, কিন্তু কোথায় যাওয়া যাবে? যেখানে হোক বললেই তো হ'লো না: কত মাশুল, কোথায় উঠবো, কী ক'রে কাটবে দিন। এ-সব ভাবনা শুরু হয় ছুটির তারিখের অনেক আগে থেকে, মুখে-মুখে চলে গুনগুনানি। প্রতি বছর এই প্রশ্নটা ঘরে-বাইরে পথে-ঘাটে মুখ থেকে

মুখে আছাড় খেয়ে ফেরে : এবার কোথায়। এ নিয়ে অনেক তর্ক হ'য়ে যায়, ড্রয়িংরুমে অনেক বাক্‌যুদ্ধ ঘটে, কোনো বিশেষ জনপদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে ব্যয়িত হয় অনেক রসনার তেজ ও চাতুর্য। ফল এই হয়, আমাদের মনটা কখনো ঝোঁকে এদিকে, কখনো ওদিকে ; প্রায় যে-কোনো জায়গার বর্ণনা শুনেই এমন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে যে বসন্তের অতিলুব্ধ ভ্রমরের মতো বাতাসেই স্থির হ'য়ে থাকে, কোনো ফুলের উপরেই বসতে পারে না। যেখানে সকলের দাবিই প্রায় সমান সেখানে নির্বাচন বড়ো কঠিন। সেই আলাপ-আলোচনা চলে উত্তেজিত স্রোতে, টাইমটেবিলের দুর্গম পথে চলে আমাদের যাত্রা, এবং টাইমটেবিল দেখে-দেখে মনে-মনে অনেক ভ্রমণই আমরা সাঙ্গ করি। পৃথিবীতে যত রকমের যত পুস্তকের প্রণয়ন হয়েছে তার মধ্যে এই টাইমটেবিল নিশ্চয়ই এক আশ্চর্য সৃষ্টি। এতে সাহিত্যের রস নেই, ভূগোলের রূপ নেই, নীরক্ত গাণিতিক ভাষায় এর রচনা, এর মর্মে প্রবেশের পথ প্রায়ই জটিল—কিন্তু এর খুদে-খুদে অক্ষরের বিচিত্র চিহ্ন-কণ্টকিত পৃষ্ঠাগুলি মনটাকে এমনভাবে কেড়ে নেয় যেটা সাহিত্য বিজ্ঞানের খুব কম বই-ই পারে। এটা নিঃসংশয় যে এত কম খরচে আমাদের কল্পনাকে এমনভাবে চেতিয়ে তুলতে আর-কোনো বই পারে না। বর্ণনা নেই, উচ্ছ্বাস নেই, তবু কত দূরের ও বিচিত্র দেশের ছবি অনায়াসে আমাদের চোখের সামনে খুলে যায়, সরু-সরু কলমগুলি কত সহজে আমাদের নিয়ে যায় পরিবর্তমান দীর্ঘ পথ পার ক'রে, কয়েক ইঞ্চি পর-পর ভাষা বদলে যাচ্ছে, আচার-ব্যবহার বদলে যাচ্ছে—অতি ক্ষুদ্র একটা

স্টেশনের নগণ্য নামের আওয়াজ থেকেই যেন নতুন প্রদেশের সমস্ত আবহাওয়ার স্পর্শ পাই আমরা।

শেষ মুহূর্তে ঠিক করলুম ওয়াল্ট্যায়ার। চলো সমুদ্রে, পাহাড়ে ঘেরা সমুদ্রে। কথাটা প্রথম বেরোলো যার মুখ থেকে সে মক্ষিরানি। আমার মন উত্তরে ছুটেছিলো, হিমালয়ের দিকে, কিন্তু মক্ষিরানির হঠাৎ-বলা কথাটাই মগজে ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত কাজে ফললো। পুজো এসে গেছে, কলকাতায় টিপটিপ বৃষ্টি। ইতিমধ্যে অনেকে চ'লে গেছেন বাইরে; এক বন্ধুকে তো আমরা আশা দিয়ে তুলে দিলুম দারজিলিঙের উচ্চচূড়ায়। আজকাল দারজিলিঙ যেতে রেলের টিকিট ছাড়া আরো কিছু লাগে: সেটি সরকারি ছাড়পত্র। তার জন্য আরজি পেশ করেছিলুম আমরাও, কিন্তু মক্ষিরানির বয়স যেহেতু পঁচিশের নিচে, তার দারজিলিঙ-যোগ্যতা আইনের মতে স্বতঃসিদ্ধ নয়। অতএব রাজশক্তির গহন অঞ্চলে যতদিন ধ'রে অন্বেষণ চললো ততদিনে ছুটি আরম্ভ হ'য়ে গেছে, শেষ বর্ষার জের চলছে কলকাতায়। অনেক কাজ ছিলো হাতে, সব শেষ হয়েছে: এখন ক্লান্ত শরীরে মনে নতুনের পিপাসা। তুষারে ঘেরা পাহাড়ি পথে এবার আমাদের পা পড়লো না, আমরা চললুম দক্ষিণের উন্মুক্ত সমুদ্রের দিকে। সরকারি ছাড়পত্র যেদিন এসে পৌঁছলো তার দু-দিন আগেই আমরা বেরিয়ে পড়েছি।

মান্দ্রাজ মেল

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, গাড়িতে ভিড় নেই। এবার আমরা ইন্টার ক্লাশের যাত্রী, তার উপর আমরা মানে দু-জনেরও উপরন্তু কিছু। এই উপরন্তুটি হচ্ছেন মানবিকা। তিনি আকারে অতি ক্ষুদ্র, রেলের মাশুলও তার লাগে না, কিন্তু সবচেয়ে প্রচণ্ড দাব-রাব তাঁরই। কোনো অসুবিধে তার সইবে না; ঠিক শোবার জায়গাটি চাই, ঠিক সময় খাওয়াটি চাই, ইচ্ছে হ'লেই তিনি কান্না জুড়বেন, ইচ্ছে হ'লেই শুরু করবেন হৈ-হৈ আনন্দধ্বনি। তাব বাহন হওয়া সহজ কথা যে ভাবে, জীবনের সে কিছুই জানে না। তাঁকে সামলানোই আমাদের মতো দু-জনের পক্ষে যথেষ্ট কাজ, এবং কাজটা এমন ধরনের যাতে আমি অন্তত একেবারেই অপাবদর্শী।

যা-ই হোক, মানবিকার সমস্ত অধিকারই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। দুটো মুখোমুখি বেঞ্চিব মাঝখানে ঠেশে দেয়া হ'লো বাঁধা বিছানাটা, ফাঁকটা ভ'রে গিয়ে বেশ চওড়া বিছানামতো হ'লো। পাতা হ'লো চাদর বালিশ, মানবিকাকে শোয়ানো হ'লো, নিশ্চিন্ত হ'লো মন। শুনতে পাই, এবার পুজোয় কাপড় আর বই অপেক্ষাকৃত কম বিক্রি হয়েছে, কেননা লোকে ভ্রমণে বেশি খরচ করেছে। কিন্তু ভারতের দক্ষিণাপথে বাঙালি নিশ্চয়ই কমই যায়; নয়তো এই ভরা পুজোর গাড়িতে এতখানি জায়গা আমাদের জুটতেই পারতো না। ভিড়ের ভয়ে অনেকটা আগেই স্টেশনে এসেছিলুম; সঙ্গে বন্ধুরা এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে গল্প ক'রে সময় কাটলো। একজন কেবলই বলতে থাকলেন, 'অণ্ড্রি পণ্ড্র বিণ্ডি', কি 'কণ্ডলি

সগুলু বডম্ব'—মান্দ্রাজি গাড়িতে চড়েছি কিনা, ও-রকম না-বললে মানাবে কেন? সময় হ'য়ে এলো; বন্ধুরা যথারীতি আমাদের চিঠি লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, কিন্তু আমরা চিঠি লিখতে বলতে পারলুম না, কেননা আপাতত আমাদের কোনো ঠিকানা নেই। একটা কথা হচ্ছিলো একটানা অতদূর না-গিয়ে পথে গোপালপুর-অন-সী-তে নেমে দু-একদিন বিশ্রাম ও সমুদ্র-স্নান ক'রে যাবো, কিন্তু এখন পর্যন্ত মনস্থির করিনি, কাল সকালে যা মনে হয় করা যাবে। সত্যি বলতে, কিছুই আমাদের ব্যবস্থা করা নেই: ওয়াল্ট্যায়ারে (কি গোপালপুরে) গিয়ে কোথায় উঠবো তাও জানি না। শুনেছি, দু-জায়গাতেই ঘর ভাড়া পাওয়া যায় সমুদ্রের ধারে; আর কোনো হোটেল থেকে যদি খাবার আনিয়ে খাওয়া যায় তবে ভালো, তা না-হ'লেও ভয় করিনে। কেননা আমরা প্রায় স্বাবলম্বিতার উদাহরণ হ'য়েই চলেছি। সঙ্গে চলেছে চা কফি বিস্কুট চিনি টিনের দুধ চায়ের বাটি, এমনকি বড়ো বিছানাটার গহ্বর থেকে কিছু চাল ডাল মশলা বেরোলেও অবাক হবার কিছু নেই। ছোট্ট স্পিরিট-ল্যাম্প আর এক বোতল স্পিরিট নেয়া হয়েছে—মক্ষিরানি বড়ো স্টোভটাই আনতে চেয়েছিলো, আমি প্রাণপণে বারণ করেছিলুম। জবড়জং লটবহর আর বাড়িয়ে কাজ নেই, এই ছিলো আমার যুক্তি। এমনিই তো এক ছোটোখাটো সংসার টেনে নিয়ে চলেছি। কিন্তু হায়রে অদূরদর্শী পুরুষ! শিগগিরই এমন সময় এলো, যখন একটি স্টোভই হ'য়ে উঠলো সকল পার্থিব বস্তুর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে কাম্য; আর তখন, আমার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে স্টোভটা নিয়ে আসেনি ব'লে মক্ষিরানির বুদ্ধিকে আমি যথেষ্ট

ভৎর্সনা করেছি। হায়রে অসহায় পুরুষ! ভারতবর্ষে টুথব্রাশ পকেটে নিয়ে বেড়ানো যায় না এ তো জানা কথা। আমরা, যারা না পারি নিশ্চিন্ত মনে পয়লানম্বরি বিলিতি হোটেলে উঠতে, না পারি যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন থাকতে, আমাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সংসার টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আধুনিক সভ্যতার উপর নিশ্চিন্ত নির্ভর যারা করতে পারে, শ্বেতাঙ্গ বাদ দিলে এ-দেশে তারা ক-জন? বলতে হয় এই যে, হয় সভ্যতা এখনো আমাদের দেশে পুরোপুরি আসেনি, নয় ঠিক এমনভাবেই এসেছে যাতে তার পুরোপুরি সুবিধেটা আমরা না পাই।

গাড়ি চলেছে। দক্ষিণের গাড়ি স্পীডের জন্য বিখ্যাত নয়, তবু প্রথম ধাক্কায় গতিটা লাগছে মন্দ না। আস্ত একটা বেঞ্চি জুড়ে শুয়ে আছি, কিন্তু ঘুম আসছে না। বই পড়ার চেষ্টা করছি, গাড়ির ঝাঁকুনিতে আর আলোর অসুবিধেয় পড়া যাচ্ছে না। আমাদের এই কামরায় ভিড় নেই বটে, কিন্তু ফাঁকা জায়গাও নেই। ঠিক যে-ক-জন আরামে শুয়ে যেতে পারে, সে-ক-জনই যাত্রী। তার মধ্যে একজন আমার চেনাও বেরিয়েছে, একটি মুসলমান নব্য হাকিম, পুবাকালে আমরা এক কলেজে পড়তুম। তিনি কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছেন গোপালপুর। আলাপ ক'রে জেনেছি, তাঁরা উঠবেন সী-সাইড নামক ফিরঙ্গ হোটেলে; দৈনিক মাশুল পাঁচটাকা। আমাকে বললেন, 'চলুন আপনারাও ওখানে, বেশ ভালো হোটেল।' ভালো যে সেটা সন্দেহ করলুম না, পাঁচটাকার

জায়গায় দশটাকা দিলে আরো ভালো ব্যবস্থা হ'তে পারে সেটাও আমরা জানি। কিন্তু আপাতত আমাদের পকেটের পক্ষে সম্ভবপর কোনো হোটেলের খোঁজ পাওয়া গেলো না। মক্ষিরানি বললো, যাকগে, ডাকবাংলো তো আছে। চিল্কার ধারে এক ডাকবাংলোয় দুটো দিন আমাদের স্বর্গের মতো কেটেছিলো একবার, সেই থেকে ডাকবাংলো সম্বন্ধে আমাদের উভয়েরই দুর্বলতা। আর সত্যি, যদি কপালগুণে ডাকবাংলোটা সম্পূর্ণ নিজেদের দখলে পাওয়া যায়, খুব ভালো হোটেলে থাকার চাইতেও তাতে আরাম বেশি। ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় পঞ্চভোজের আবির্ভাবের চাইতে অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা অনেক বেশি লোভনীয় নিশ্চয়ই। এবং তার জন্য ভোজ্যবস্তুর স্বল্পতা যে সহ্য না করবে তেমন মানুষ আমি নই। ··কেবল অন্নে নয়। নিজের কর্মস্থলে যথেষ্টই নিয়ম মেনে চলতে হয়, ঈশ্বর জানেন; বেড়াতে এসেও আপিশমাফিক খানাপিনা যার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ, তার আত্মা আপিশ ছাড়া আর-কিছুর উপযুক্ত কিনা ঈশ্বর তার বিচার করবেন। হোটেলের বিজ্ঞাপনে দেখতে পাই 'আধুনিক সুখ-সুবিধে'গুলো সাড়ম্বরে ঘোষিত হ'য়ে থাকে : যেমন রেডিও, পানশালা, টেনিস—তাছাড়া 'সোসাইটি'। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার এই সব মহার্ঘ দান উপভোগ করাই যদি আমার উদ্দেশ্য তাহ'লে রাজধানীর মাটি কেন ছাড়বো? এবং ঠিক ঐ সব আমোদের লোভেই যাঁরা নানাদিকে ছিটকে পড়েন তাঁরা কেন যে কষ্ট করেন এবং রেলকোম্পানিকে চাঁদা দেন আমি তো তা বুঝতে পারি না। কলকাতায় যে-সব জিনিশ শ্রেষ্ঠ এবং সুলভতম, তারই টানে

চলেছি কিনা কলকাতা ছেড়ে! সহজবুদ্ধিতে এটা বিশ্বাস করা শক্ত।

কলকাতা থেকে বেশির ভাগ রেলযাত্রা সন্ধ্যার অনতিপরে শুরু হ'য়ে পরের দিন সকালে শেষ হয়। আরাম এবং সুবিধের দিক থেকে এ-ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো সন্দেহ নেই, তবু এক-এক সময় একটু আপশোষ না-ক'রেও পারিনে। যে-পথ দিয়ে এখন চলেছি সে-পথে আগেও যাওয়া-আসা করেছি কয়েকবার, কিন্তু পথের কিছুই চোখে দেখিনি। দেখবার মতো কিছুই নেই হয়তো—কিংবা অনেক আছে—মাঠ বন ঝোপঝাড়, মাঝে-মাঝে নদী, মাঝে-মাঝে সবুজ নিশেন-দেখানো পিছনে-ফেলে-আসা ছোটো স্টেশন, কোনোটাই আশ্চর্য নয়, কিন্তু চলতি গাড়ির জানলা থেকে অতি সাধারণও অপরূপ হ'য়ে ওঠে। সমস্ত পৃথিবী একটি গতিশীল দৃশ্যপট হ'য়ে ফুটে ওঠে চোখের সামনে, চোখ দৌড়ে চলে যেন পক্ষীরাজের সওয়ার হ'য়ে উন্মুক্ত অফুরন্ত ছুটির হাওয়ায়। ঢালু আকাশে ছাখো মেঘের আনাগোনা, মাঠের মধ্যে কয়েকটা গোরু আর কুচকুচে কালো উলঙ্গ ছেলেটা, ফুটফুটে তুটো হাঁস ঐ নালায় ···কিন্তু দেখতে-না-দেখতেই অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, আর এই অসহিষ্ণু অস্থিরতাতেই বঙ্গপ্রকৃতির একঘেয়ে সমতলতাও বিচিত্র হ'য়ে ওঠে। তারপর রেলগাড়ি যখন লাইনের বাঁকে-বাঁকে আধেক গোল হ'য়ে ঘুরে যায়, সেটাও একটা দেখবার মতো কিছু বইকি। কিন্তু আমাদের পথ দিনের আলোয় প্রায়ই পড়ে না; প্রায়ই আমরা গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি আর জেগে উঠি গন্তব্য স্থানের

কাছাকাছি এসে, কি শুয়ে-শুয়ে শূন্যচোখে খামকা তাকিয়ে থাকি। যেমন আমি তাকিয়ে আছি খামকা শূন্যচোখে, মানবিকা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, মক্ষিরানিও ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ, গাড়ি ছুটেছে পুরোদমে, শিগগিরই বোধহয় খড়্গপুর। মানবিকার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে জানলার কাচ তুলে দেয়া হয়েছে, তাই বাইরের দিকে তাকাতে গেলে পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে এই কামরারই আবছা কিন্তু সম্পূর্ণ ছবি—বিরক্তিকর পুনরুক্তি। যথাসাধ্য আরামের ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে যাত্রীরা সকলেই ঘুমন্ত, ঐ সংকীর্ণ পরিসরে একজন পাশবালিশ পর্যন্ত জড়িয়েছেন। ঘুমের বোঝা নিয়ে গাড়ি চলেছে রাত্রিকে বিদীর্ণ ক'রে।

শেষরাত্রে ভুবনেশ্বর। সেবারে প্রায় এই সময়েই এই স্টেশনে নেমেছিলাম আমরা। এখানে পাখি ডাকে, এখানে ভোর আসে শিশির-ছড়ানো, সোনালি-সবুজ। ছেড়ে গেলো ভুবনেশ্বর, খুরদা রোডে আসতে-আসতে ঘুম-ভাঙানো আলো ফুটলো। এলো আমাদের জন্য চা, আর মানবিকার জন্য গরম দুধ ফ্লাস্কে ভ'রে। পুরীর লাইন বেঁকে বেরিয়ে গেলো অন্যদিকে, দেখতে-দেখতে আমাদের চোখ থেকে হারিয়ে গেলো—তারপর চিল্কা, আলো-ভরা আকাশের মস্ত উজ্জ্বল আয়নার মতো; কখনো দূরে, কখনো কাছে; নিস্পন্দ, নিঃশব্দ, কখনো সমুদ্রের মত দিগন্ত-ছোঁয়া। বালুগাঁ, খালিখোট, তারপর রম্ভায় এসে দাঁড়ালো। অবাক হবার কিছু নেই, কিন্তু সেবারে যেখানে দুটো দিন স্বর্গের মতো কেটেছিলো আমাদের, সেই ডাকবাংলোটি এখনো ঠিক তেমনি

দাঁড়িয়ে আছে। দরজা-জানলা বন্ধ, কেউ আছে ব'লে মনে হয় না। নেমে পড়লে কেমন হয়···আবার ? আমি বললুম, 'নামবে নাকি এখানে ?' মক্ষিরানি বললো, 'নামবে নাকি ?' গাড়ি ছেড়ে দিলো। এর পর থেকে আমাদের পক্ষে নতুন পথ।

ততক্ষণে বেলা বেড়েছে, বেশ গরম হ'য়ে উঠেছে এরই মধ্যে, গাড়িতে ব'সে আর ভালো লাগছে না। গোপালপুরে নামতেই হবে। একটা দিনের আশ্রয় কি আর জুটবে না কোথাও ? ঘণ্টাখানেক পরেই বহরমপুর স্টেশন, সেখান থেকে মোটরে দশ মাইল, তবে সমুদ্রের স্নিগ্ধতা ও শান্তি। পুঁজি তেমন ভারি নয় আমাদের, গোপালপুরে দু-একদিন কাটালে বাড়তি খরচ কতটা হ'তে পারে তারই হিশেব করছি মনে-মনে। গোঁয়ার গণিতকে কিছুতেই নিজের ইচ্ছেমতো চালানো যায় না, দশ থেকে পাঁচ বাদ দিলে নেহাৎই একটা পাঁচই প'ড়ে থাকবে প্রত্যেক বার ; যে-কথাটা স্পষ্ট ক'রে না-বললেই শোভন হয়, সেটা সে বর্বরের মতো ঘোষণা না-ক'রে ছাড়বে না। ভদ্র সভায় পাটিগণিত অপাংক্তেয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কাছে এলো বহরমপুর। আশে-পাশে সুন্দর বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে। ঐ বুঝি ডাকবাংলো ? কী সুন্দর ! মক্ষিরানি বললো, 'এসো না এখানেই থাকি, ট্যাক্সি ক'রে সমুদ্রে গিয়ে নেয়ে এলেই হবে।' না, না, তা কি হয় ! খরচ তো একই হবে, অথচ সমুদ্রের ধারেও থাকা হবে না ! অভীষ্ট আমাদের সমুদ্রই, আর-কিছু তো নয়। গোপালপুরে ডাকবাংলো আছে ব'লে টাইমটেবিলে লেখা নেই, সেই হয়েছে ভাবনা।

তা তেমন বিপদে পড়লে ফিরিঙ্গি হোটেলটা তো আছে। আসলে আমরা বেশ ক্লান্ত হয়েছি ততক্ষণে, হাত-পা ছড়িয়ে জিরুতে পারলে এখন বাঁচি।

বহরমপুর। অনেক যাত্রী নেমে পড়লো এখানে। আমরাও নেমেছি। শ্বেতাঙ্গবেশী এক ঘোর কৃষ্ণকায় ব্যক্তি প্ল্যাটফরমে উপস্থিত, সী-সাইড হোটেলের প্রতিনিধি ইনি। আলাপে প্রবৃত্ত হলুম। কত মাশুল? পাঁচ টাকা। দু-জনের? আচ্ছা, আট টাকাই দেবেন। মনে-মনে মাথা নাড়লুম। আর খাওয়া বাদ দিয়ে একটা ঘর? দু-টাকা, অনিচ্ছার উত্তর এলো। একটা ট্যাক্সি ঠিক ক'রে দেবো কি? আচ্ছা। ট্যাক্সির ভাড়া পাঁচ টাকা শুনেছিলুম, কিন্তু ইনি ঠিক করলেন ছ-টাকায়। এর কমে যাবে না। যাকগে, আর রোদ্দুরে দাঁড়াতে ভালো লাগছে না; স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লুম, মানবিকা, মালপত্র সর্বসমেত। ট্যাক্সিওলার সঙ্গে দরদস্তুরের চেষ্টা করলুম, সে কানেই তুললো না কথা। অবশ্য বাক্‌বিতণ্ডা বেশি দূর গড়াতে পারেনি, কেননা ট্যাক্সিওলা দুটো-চারটে কথার বেশি হিন্দি কি ইংরিজি কোনোটাই বলতে পারে না, এদিকে হিন্দি বলতে গেলে আমার রসনায় এমন জড়তা আসে যে প্রায় বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হয়। মক্ষিরানিরও অবস্থা প্রায় তা-ই। উড়িয়া ভাষার সীমা পেরোলেই বাংলা অচল, হিন্দির প্রচলনও ক্রমশই কমতে থাকে। তবু এবারের ভ্রমণের এই ক-দিন আমরা বেপরোয়াভাবে হিন্দিই চালিয়েছিলুম, তার ব্যাকরণ শুনলে পণ্ডিতজীদের ভির্মি লাগতো, কিন্তু আমাদের কাজ চলেছিলো। গঞ্জাম জেলার ভাষা অন্ধ্র প্রদেশের মতোই তেলেগু;

অধিবাসীরাও আকৃতি-প্রকৃতিতে মাদ্রাজি, একে-যে সম্প্রতি উড়িষ্যার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে সেটা নেহাৎই গায়ের জোরে। এতে মনে পড়ে বাংলা-বলা সে-সব জেলার কথা, যাদের ঢোকানো হয়েছে আসামে, উড়িষ্যায়, ছোটোনাগপুরে, সাঁওতাল পরগনায়। রাজনীতির মর্ম বুঝি না, কিন্তু দেশের প্রধানতম জীবন্ত যোগসূত্র যে-ভাষা, সেখানে বিচ্ছিন্ন করলে অস্বাভাবিক লাগে, যেন বিশ্বাস করা যায় না।

ট্যাক্সি রওনা হ'লো। ন-টা বেজে গেছে, বেশ গরম। পায়ের কাছে অনেক খুচরো জিনিশ ছড়ানো ব'লে বসাটাও তেমন আরামের হয়নি। এর মধ্যে মানবিকা জুড়ে দিলেন কান্না। চড়-চাপড় লক্ষ্মী-সোনা কত কিছু, কান্না কি থামে! কী ব্যাপার? খিদে পেয়েছে। এক্ষুনি এই মুহূর্তে খাওয়া চাই তাঁর। মক্ষিরানি বললো, ফ্লাস্কে দুধ আছে, খাইয়ে দিই। বেরোলো বাটি ঝিনুক, কিন্তু উঁচু-নিচু পথে গাড়ির যা ঝাঁকুনি, বাটির দুধ ভূমিকম্পে পুকুরের মতো উত্তাল। অতএব নানারকম কসরৎ শুরু হ'লো, রোদ ঠেকাতে ছাতা খুলে ধরতে হ'লো আমাকে। আবার টেনে আনতে গিয়ে ছাতা ভাঙলো, অর্ধেক দুধ প'ড়ে গেলো উলটিয়ে, শেষ পর্যন্ত গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাকিটা দুধ চালান করা হ'লো মানবিকার জঠরে। সবসুদ্ধু যাকে বলে কাণ্ড একখানা!

পথ যেন আর ফুরোয় না। পরে শুনেছিলুম, আমাদেরই পরিচিত এক ভদ্রলোক এই পথের ট্যাক্সিভাড়া দিয়েছিলেন দু-টাকা বারো আনা। পৃথিবীটা যোগ্যেরই ভোগ্য সন্দেহ নেই। যাক, মানবিকা আপাতত শান্ত হয়েছে এটুকুই ভাগ্য। ঐ এলো গোপালপুর। এখন পর্যন্ত আমার

কল্পনায় গোপালপুরের একটা ছবি জ্বলছে, একটু পরেই তা চিরকালের মতো নিবে যাবে। কোনো নতুন জায়গার চেহারাটা কল্পনায় যে-রকম ভাবি, সত্যি-সত্যি কখনোই সে-রকম হয় না ; এবং একবার চোখে দেখার পর অনেক দিনের সেই কল্পনার ছবি কুয়াশার মতোই মিলিয়ে যায়—পরে তাকে চেষ্টা ক'রেও ফিরে পাওয়া যায় না।

রাস্তায় লোকজন দেখা দিলো, বাড়িঘর বস্তি ঘন হচ্ছে, আমরা পৌঁচেছি। হঠাৎ একটা রাস্তার মোড়ে দেখা গেলো মুটিশ লটকানো : ডাকবাংলো। ঐ তো আমাদের আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয়স্থল। আর তারই একটু দূরে একবার শাদা সমুদ্র ঝিলিক দিলো। নামলুম আমি গাড়ি থেকে, গিয়ে উঠলুম ডাকবাংলোয়। গিয়ে দেখি, সামনের ঘরের বড়ো টেবিলে এন্তার চা রুটি বিস্কুট মাখন ছড়ানো, আর তিনজন শর্টস-পরা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে-সব ভোজ্যবস্তুর সদ্গতি করছেন। আমি ইংরিজিতে জিগেস করলুম : এখানে কি জায়গা আছে? তাঁরা বললেন, নেই। একেবারেই নেই? না। হতাশ হ'য়ে চ'লে আসছি, এমন সময় পিছন থেকে বঙ্গভাষায় ডাক শুনলুম : ও মশাই, শুনুন, শুনুন। ফিরে যেতে : আপনি বাঙালি? হ্যাঁ, বাঙালি। আপনাকে মান্দ্রাজি ভেবেছিলুম যে। আমিও তো আপনাদের তা-ই ভেবেছিলুম। ব্রাহ্মণ? না, মশাই, ব্রাহ্মণ-ট্রাহ্মণ নই ; একটু ভেবে দেখবেন, আপনাদের জাত না যায়। আচ্ছা, একটা ছোটো ঘর আপনাদের ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু আপনাদের অসুবিধে হবে। তবে পরশুই আমরা চ'লে যাচ্ছি। ছোটো ঘরটা দেখলুম, দেখে চিন্তিত বোধ

করলুম। তখন ওঁরা বললেন, বীচ হাউসে আপনারা নিশ্চয়ই ঘর খালি পাবেন, সেখানে যান। ধন্যবাদ, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চললুম বীচ হাউসের দিকে। সী-সাইড হোটেল ছাড়িয়ে একটু দূরেই এই সৈকত-ভবন। বাড়িটার বাইরের চেহারা মনোরম নয়, গুদোম গোছের। একজন লোক বেরিয়ে এলো, সে ইংরিজি বলে। ঘর খালি আছে? আছে। সমুদ্রের উপরে তো? সমুদ্রের উপরে। মক্ষিরানি রইলো জিনিশের পাহারায়, আমি গেলুম লোকটার সঙ্গে ঘর দেখতে। একটা ফটকমতো পার হ'য়ে, বারান্দা পার হ'য়ে, উঠোন পার হ'য়ে, সে একটা বন্ধ দরজার তালা খুললো। প্রথমেই মস্ত একটা অন্ধকার ঘর, দেখে চিত্তে কিছু পুলক লাগে না। তারপর একটা ছোটো ঘর, সে-ঘরের দরজা জানলা খুলতেই আমি অবাক। দরজার বাইরেই সমুদ্রের অপরূপ নীল। সমুদ্রের উপরে মানে একেবারেই উপরে যে। দরজা থেকে পা বাড়ালেই বালু, মাঝখানে কিছু নেই। কত ভাড়া? দু-টাকা। তক্ষুনি ঠিক ক'রে ফেললুম। গোপালপুরে এ-রকম কয়েকটাই বাড়ি আছে পাশাপাশি, যেন সমুদ্র থেকেই উঠেছে তারা, কিন্তু সমুদ্র তাদের পিছন দিকে ব'লে ঢোকার সময় কিছুই বোঝা যায় না।

এলো সেই ঘরে মালপত্র, সঙ্গে এলো চার-পাঁচজন স্ত্রী পুরুষ, কেউ তাদের নুলিয়া, কেউ ঝি হ'তে চায়, কেউ রান্নার ঠাকুর। তাদের সমবেত দাবির ঘোষণায় দিশেহারা হ'য়ে উঠলুম। এমন সময় পাপ্পার প্রবেশ। কালো, মস্ত জাঁদরেল চেহারা, খাটো শাড়িটা বুকের উপর দিয়ে ক'ষে আঁট ক'রে

বাঁধা, কুচকুচে মসৃণ পিঠের অনেকখানি অনাবৃত। এসে বললে, আমি হচ্ছি ম্যানেজার। রোমাঞ্চিত হলুম। তার কাংস্যস্বরের অনর্গল ভাষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারি এমন ক্ষমতা তখন অন্তত আমাদের ছিলো না। কিছু তার মধ্যে কাজের কথা : যেমন, ক-দিন থাকবে, কী রান্না হবে, কে রান্না করবে। রোজ চার আনায় এক বুড়ি ঝি ঠিক করা গেলো, নাম তার দণ্ডাইসি। অবশিষ্ট জনতাকে প্রচণ্ড ধমকে বিতাড়িত করলো পাপ্পা। তার উদ্যত বাহুর সামনে কঠিনতম নুলিয়া-প্রাণও পিছু হ'টে অপসারিত হ'লো। খোলা হ'লো বাক্স বিছানা, মুহূর্তের মধ্যে নানা সাজে সরঞ্জামে পাতা হ'য়ে গেলো আমাদের দু-দিনের সংসার।

এখন প্রথম কর্তব্য হচ্ছে চা-পান। মক্ষিরানি তার স্পিরিটল্যাম্প ধরিয়ে চা তৈরি করলো, চা খাওয়া শেষ হ'তে-হ'তে বেলা বাজলো বারোটা। বাজুক, কোনো তাড়া নেই। দণ্ডাইসিকে ডিমের খোঁজে বাজারে পাঠানো হয়েছে, ঐ স্পিরিট-ল্যাম্পেই মক্ষিরানি রান্না করবে। ততক্ষণ চেয়ে ছাখো অফুরন্ত নীল সমুদ্র, ক্লান্তি দূর করো। সমুদ্রের মদির হাওয়া অবিশ্রাম বইছে, ক্লান্তি দূর করো।

কোনো তাড়া নেই।

একটি শোবার ঘর, একটি স্নানের ঘর আর তার পাশেই কাপড় ছাড়ার ঘর, প্রকাণ্ড খাবার ঘর একটি আর তার পাশে পার্টিশন-দেয়া একটা ঘর বোধহয় চাকরদের জন্য, আর তার পরে রান্নাঘর প্রকাণ্ড চুল্লি-বসানো···দৈনিক দু-টাকায় এতটা জায়গা আমাদের অধিকারে। বর্গফুট ধ'রে মাপলে ভবানীপুরে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় যতখানি জায়গা পাই, তার চেয়ে কম হবে না। তবে কিনা এখানে এত জায়গা আমাদের লাগবে কিসে! ছোট্ট শোবার ঘরেই কুলিয়ে যায়। আর ড্রেসিংরুম ব'লে যেটার পরিচয় সেটা লাগে নানাবিধ সাংসারিক কাজে; বাড়তি জায়গাগুলোয় শুধু যে আমাদেব দরকার নেই তা নয়, তাতে রীতিমতো অদরকার—অসুবিধে। এই সমুদ্রের ধারে কয়েকটা দিন কাটাবার পক্ষে নিবিড়তাই সবচেয়ে ভালো।

সেই ছোট্ট স্পিরিট-ল্যাম্পেই রান্না। সাত প্রস্থ ভোজন ঠিক হয় না; তবে ভাতের সঙ্গে ডালসেদ্ধ গোটা দুই কাঁচালঙ্কা আর কাঁকরের মতো বড়ো-বড়ো নুনের দানার সঙ্গে অতি উপাদেয় সুখাদ্য ব'লেই বোধ হয়, আর তার উপর ডিম কি মাছমাংস যেটা জোটে সেটার সৌরভ ও স্বাদ রসনা থেকে আত্মা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'তে থাকে। আহারের পর পান পর্যন্ত বাদ যায় না; আমি দেখে এসেছি এই বাড়ি থেকে বেরিয়েই একটা পানের দোকান। প্রথম দিন একটু ভয়ে-ভয়েই ওদের সাজা পান এনেছিলুম; কিন্তু চর্বণ ক'রে আনন্দ হ'লো। এ-দেশের যে-কোনো লোক পান সাজতে জানে। কলকাতার

ভালো পানওলারা মান্দ্রাজি শুপুরি দিয়ে পান সাজে ; অমন মসৃণ সরসতা আর-কিছুতেই হয় না। তাছাড়া, মান্দ্রাজি পানের কিছু বিশেষত্ব আছে কিনা জানি না, নাকি এটা ওদের রচনারই কৌশল ; কিন্তু একটি পয়সার বিনিময়ে যে-বৃহদাকার বস্তুটি এরা হাতে তুলে দেয় তার স্বাদে রসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনটা বেশ খুশি হ'য়ে থাকে। ওয়াল্টায়ারে পথে-ঘাটে যে-কোনো জায়গায় পান কিনে খেয়েছি ; কলকাতার তিন মাইল রাস্তার মধ্যেও কোনো একটা দোকানে ও-রকম মিলবে কিনা সন্দেহ করি। দুটো ছোটো-ছোটো শাদা পানের পাতা দিয়ে উপরটা মোড়া থাকে ; আমি প্রথমে ওটা ফেলে দিয়েছিলুম, কিন্তু ওটা সুদ্ধুই খেতে হয়। একমাত্র আপত্তি আমার এই যে আকারে এরা এত বড়ো যে সবটা একসঙ্গে মুখে পোরা সহজ হয় না—অন্তত আমার পক্ষে হয়নি।

একদিন বিশ্রাম করবো ভেবেই গোপালপুরে নেমেছিলুম, কিন্তু ভালো লেগে গেলো। আশ্রয় সম্বন্ধে উৎকণ্ঠার অবসান যেই হ'লো, মনের মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধতা নামলো যে ভাবলুম এখানে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে যাই। বেশ লাগছে। ছোট্ট জায়গা এই গোপালপুর, সমুদ্র একে তিন দিক দিয়ে ঘিরে রয়েছে আধো চাঁদের আকারে, সমুদ্রকে ফেলে খুব বেশি দূর যাওয়া সম্ভবই নয় এখানে। পুবদিকের ধূ-ধু সমুদ্রে যেন স্বপ্নের সীমা এঁকে দিয়েছে অস্পষ্ট নীল পাহাড়ের রেখা। জায়গাটিও বেশ উঁচুনিচু, অল্প কয়েকখানা বিলিতি ছাঁদের বাড়ি, প্রায় হাতে গোনা যায়, নুলিয়াদের বস্তি—একদিন বিকেলের পড়ন্ত আলোয় বড়ো সুন্দর লেগেছিলো

চোখে—ঢেউ-খেলানো একমুঠো জায়গা হঠাৎ গাছপালার আড়ালে। হয়তো বেড়াতে বেরিয়েছি, বাজারের দিক থেকে ফিরতে-ফিরতে হঠাৎ একসার ঝাউগাছের ফাঁকে সমুদ্র ঝিলমিলিয়ে উঠলো, কিংবা উল্টো দিক থেকে ট্যারচা হ'য়ে এসে চমক লাগালো চোখে. সমুদ্র বেশি দূরে নয়, সমুদ্র কখনোই বেশি দূরে নয় এখানে। কোথাও দেখি সমুদ্রের জল ডাঙার ভিতবে খানিক ঢুকে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে, সেই লোনা জলের পল্বলেব উপর দিয়ে খেয়ানৌকোর যাওয়া-আসা ; এদিকে সমুদ্র থেকে তা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে অতিশয় সরু একটু বালুর রেখায়, তার উপর দিয়ে হেঁটে পাব হ'য়ে চ'লে যাওয়া যায়। সেই ক্ষীণ বালুরেখাটুকু সমুদ্র কেন যে এক ফুঁয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না সেটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

বাজাবে যেতে হ'লে একটি সোজা রাস্তা ধ'রে মিনিট পাঁচেক হাঁটতে হয়। চৌরাস্তার মোড়ে ডাকঘর, পাশাপাশি কয়েকটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর দোকান, বেশির ভাগই খাদ্যজাতীয় ; তা ছাড়া দেয়ালে ঘেরা একটা জায়গায় হাট বসে। তরকারি যথেষ্ট ও যথেষ্ট শস্তা ; কিছু সমুদ্রের মাছ, ভেড়ার মাংস। ডিমেব, মুর্গির অভাব নেই। 'কেলা' আর 'কম্‌লালেম্বু' ঘরে-ঘরে ফেরি করছে। খুব মিষ্টি লেবু ; কলাও চমৎকার ; কলকাতার বাজারে এই দুই প্রকার ফলেরই ও-রকম উৎকর্ষ দুর্লভ। দেখে-শুনে মনে হ'লো এখানে যতদিনই থাকি না কেন, খাদ্যাভাব হবার কারণ নেই। কিন্তু অভাব যে-জিনিশের হ'লো সেটা অপ্রত্যাশিত।

কলকাতা থেকে একটা স্পিরিটের বোতল এনেছিলাম,

সেটা পরের দিনই তলায় এসে ঠেকলো। বেরোলাম স্পিরিট কিনতে। যেখানে গিয়ে উঠলাম, সেটা নিশ্চয়ই গোপালপুরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত মনোহারি দোকান। দোকানি ইংরিজি বলে, চকোলেট বিস্কুট চা মাখন যখন যা চাও তা-ই পাবে, কিন্তু স্পিরিট? দোকানি মাথা নাড়ে। এখানে কোনো ডাক্তারি দোকান কি নেই যেখানে?···না, এখানে ডাক্তারি দোকান নেই। তবে? আমি দিতে পারি আনিয়ে বহরমপুর থেকে, আট আনা দাম পড়বে। আট আনা? বেশ, তা-ই সই। বিকেলে এলো খবরের কাগজে মোড়া বোতল, লেবেল নেই; মক্ষিরানি তার স্পিরিট-ল্যাম্প টাপুটুপু ভ'রে নিয়ে ফুর্তিসে রান্না চড়ালো। রান্না নামলো, খাওয়া হ'লো আরাম ক'রে, কিন্তু খানিক পরে মানবিকার দুধ গরম করার সময় দেখা গেলো আগুন ধরছে না। কী ব্যাপার? স্পিরিট নেই। আমাদের এই ক্ষুদ্র স্পিরিট-ল্যাম্পটির এত অল্প সময়ে এত প্রচুর ইন্ধন-গ্রাসের ক্ষমতা ছিলো ব'লে কোনোদিনই সন্দেহ করিনি। আট আনার স্পিরিটের বোতল এক-একদিনে উড়ে যেতে থাকলে অচিরেই সেই স্পিরিটে রান্না করার মতো ভোজ্যবস্তুর অভাব ঘটবে যে! পরের দিন সেই দোকানিকে গিয়ে বলি—কেমন স্পিরিট তোমার? জল মেশানো নাকি? দোকানি কী জানে, সে তো অন্য জায়গা থেকে আনিয়ে দেয়। তা লেবেল নেই কেন? দোকানি মৃদুস্বরে বলে, You see...। বুঝলুম যে ওর লাইসেন্স নেই; কিন্তু এক বোতল স্পিরিটে আধ বোতল জল মেশাবার লাইসেন্স ও নিজেই নিজেকে দিয়েছে সেটা আরো ভালো ক'রে বুঝলুম। মক্ষিরানি বেজায় রেগে গেলো, সে-রাত্রে

এক আঁটি কাঠ আনিয়ে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলো সেই রান্নাঘরের অতিকায় উনুনের সামনে। সে এক কাণ্ড! প্রথমত উনুনের উচ্চতা এতই বেশি যে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে না-দাঁড়ালে মক্ষিরানি ভাবী খাদ্যের চেহারা দেখতে পায় না; আর যেটুকুও বা দেখা সম্ভব কেরোসিনের লণ্ঠন তা আরো ঘুলিয়ে দেয়। আমি মাঝে-মাঝে গিয়ে লণ্ঠন তুলে ধরি, কড়াইয়ের উপর টর্চ ফেলি; কিন্তু মানবিকা ও-ঘরে ঘুমোচ্ছে, দণ্ডাইসি কাজ সেরে বাড়ি গেছে, আমাকে থাকতে হয় ওরই পাহারায়। আর তার উপর, কাঠের ধোঁয়া! নাকের জলে চোখের জলে এক হওয়া কাকে বলে, আক্ষরিক এবং ঔপমিক উভয় অর্থেই সেটা উপলব্ধি ক'রে সে-বেলার মতো রান্না নামালো মক্ষিরানি। হায়রে, বড়ো স্টোভটা যদি আনতুম! যদি আনতুম! মক্ষিরানিরই দোষ, তারই উচিত ছিলো আমার নিষেধ উপেক্ষা ক'রে লুকিয়ে ওটা নিয়ে আসা।

ভাগ্যক্রমে আমাদের সঙ্গে সু—বাবুর দেখা। তিনি এসেছেন আমাদের একদিন আগে এক বন্ধুকে নিয়ে; এই বীচ হাউসেই আছেন। এঁরা এক মান্দ্রাজি মেয়ে রেখেছেন বাবুর্চি হিশেবে, আর নানারকমের সুস্বাদু সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ করছেন প্রচুর পরিমাণে। ভোজ্যবস্তু সংগ্রহে সু—বাবুর অধ্যবসায় ও নৈপুণ্য দেখে অবাক লাগলো। আমরা তো বাজার ঘুরে আর-কিছু না পেয়ে গোটা দুই সাধারণ ভেটকি নিয়ে এলুম, তাও নিশ্চয়ই অত্যধিক মূল্যে: বাড়ি এসে হয়তো দেখি সু—বাবু বিখ্যাত ম্যাঙ্গো মৎস্যের

একটি বৃহৎ খণ্ড কিনে ফেলেছেন জলের দরে, কি হয়তো একঝুড়ি ব্যাকওয়াটার ফিশ, তারও খ্যাতি কিছু কম না। অভোজ্য বস্তু সংগ্রহেও সু—বাবুর উৎসাহের অভাব নেই, কোনো ফেরিওলাকে ফিরতে হয় না তাঁর দরজা থেকে। এক দেরাজ বোঝাই কড়িই কিনেছেন, কয়েকটা তার ভারি সুন্দর। শঙ্করমাছের লেজের চাবুক আর তলোয়ার-মাছের মাথার 'তলোয়ার' যা কিনেছেন তা দিয়ে ছোটোখাটো একটি জাদুঘর সাজানো যায়। দুটো অপেক্ষাকৃত ছোটো সাইজের 'তলোয়ার' আমরাও কিনে ফেলেছিলুম শেষ পর্যন্ত ;—রোজ ঘণ্টায়-ঘণ্টায় এত নিয়ে এলে কোনো-এক সময় না-কিনে আর পারা যায় না।

সু—বাবুর সংগ্রহনৈপুণ্যে আমরাও লাভবান হয়েছিলুম, সে-কথা বলাই বাহুল্য। ঘন-ঘনই আমাদের এটা-ওটা পাঠাচ্ছেন তিনি। একদিন তো এত মাছ পাঠালেন যে চোখে দেখেই পেট ভ'রে যায়। যতখানি খাওয়া সম্ভব তার চেয়ে বেশি ক'রে খেয়েও অনেক প'ড়ে রইলো। সেগুলো রেখে দিলুম পরের দিনের জন্য, কিন্তু সকালে উঠে দেখি বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। মাছ বেশির ভাগই অদৃশ্য হয়েছে, শুধু এখানে-ওখানে টুকরো ছড়ানো, আর সারা বাড়িতে বিশ্রী আঁশটে গন্ধ একটা। আমাদের চেয়েও মৎস্যপ্রিয় কোনো জীব রাত্রির অন্ধকারে এসে আমাদের আতিথেয়তা স্বীকার ক'রে গেছে ;—সকালে উঠেই সেই মৎস্যগন্ধে মনটা এমন বিগড়ে গেলো যে সেদিন আর মাছ খেতে ইচ্ছেই করলো না। আমার নিজের কখনোই মাছে অরুচি হয় না, কিন্তু সেদিন নিরিমিষই ভালো লাগলো। এই উপাখ্যানের

নীতিকথা হচ্ছে এই যে কোনো খাদ্যই একসঙ্গে অনেকগুলো চোখে দেখতে নেই; অনেকগুলো ভাত একসঙ্গে পাতে পড়লে খুব খিদের সময়ও ভালো ক'রে খাওয়া যায় না; এক হাঁড়ি কাঁচা মাছ চোখের সামনে ধ'রে রাখলে মাছ খাবার ইচ্ছে অনেক ক'মে আসে।

সু—বাবুরা খুবই আপ্যায়ন করতে লাগলেন আমাদের; আমরা আর কী করি—মাঝে-মাঝে দু-এক পেয়ালা চা, এর বেশি কিছু সম্বল নেই আমাদের। দুঃখের বিষয়, সু—বাবুর আত্মা তেমন চা-পিপাসু নয়, তবে তাঁর বন্ধুটি ঠিক সময়ে ঠিকভাবে তৈরি চায়ের অভাবে ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠেছিলেন; তাঁর তরফ থেকে আমাদের চেষ্টা কিছু সার্থক হ'লো।

হেলাফেলা ক'রে দিন কাটছে। সকালে উঠে চা-পানাদি শেষ না-হ'তেই দরজায় খড়ের টুপি পরা নুলিয়ামূর্তির আবির্ভাব। এটাতে-ওটাতে - বিশেষত, মানবিকার কারণে —আমাদের কেবলই দেরি হ'তে থাকে। পাশের বাড়িতে কয়েকটি ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষের আড্ডা, সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তারা সমুদ্রে নামে। সঙ্গে তাদের গোটা দুই শিশু, একটি অতি সুন্দর কুকুর আর দুটো হাওয়ায়-ফাঁপানো জলতোশক। এই জলতোশক নিয়ে এরা যে-মাতামাতি হুড়োহুড়িটা করে, দেখতে সেটা মন্দ লাগে না। সকালে-বিকেলে ছ-ঘণ্টা অন্তত সমুদ্রের জলে কাটায় এরা। এদের আঁটোসাটো লালচে শরীরের উপর জলের ফোঁটা রোদে চিকচিক করে; কখনো এরা ডাঙায় উঠে জিরোয়, কখনো হৈ-হৈ দাপাদাপি ক'রে গড়ায় ঢেউয়ের সঙ্গে-সঙ্গে। এরা দ্বীপবাসী, সমুদ্রের সঙ্গে

এদের রক্তের অনেকদিনের মিতালি। এদিকে আমরা বাঙালিরা মালকোঁচা এঁটে অতি সন্তর্পণে এক পা দু-পা ক'রে নামি, শাড়ি-পরা মেয়েরা আঁচল সামলাবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় বিব্রত হ'তে-হ'তে ডাঙায় উঠে বাঁচেন। আমাদের হৃদয়ের যোগ নদীর সঙ্গে ; সমুদ্রকে আমরা জীবনের মধ্যে কখনোই স্থান দিইনি। ভারতবর্ষের তিন দিকেই তো সমুদ্র ; কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সেই যে সমুদ্রকে হিন্দুর জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন এখনো তার ঐতিহাসিক স্মৃতি আমাদের মন থেকে বোধহয় মোছেনি। বর্তমানে আমাদের কারো-কারো মধ্যে যে-সমুদ্রপ্রিয়তা দেখা যাচ্ছে তাতে ইংরেজের এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব কতটা আছে সেটা বিবেচ্য।

মানবিকাকে দণ্ডাইসির হাতে গছিয়ে আমরা নামি গিয়ে সমুদ্রে। এতক্ষণে বেলা বেড়েছে, শাদা রোদে ঝলসাচ্ছে সমুদ্র, ভোরের সবুজ-সোনালি চেহারা নেই আর। আরো স্নানার্থী আসছে একটি-দুটি ক'রে ; তবে এখানে পুরীর মতো গঙ্গাঘাটের ভিড় কখনোই হয় না। জায়গাটি ছোটো, একদমে ট্রেনে এসে নামা যায় না, লোক আসে কম। তা হ'লেও, ফিরিঙ্গিরা দেখলুম জায়গাটিকে বেশ দখল ক'রে নিয়েছে। সেটা আশ্চর্য নয়, কেননা গোপালপুর-অন-সী নামে এই যে জনপদ, এক হিশেবে এটা বি. এন. রেলোয়েরই সৃষ্টি। তাছাড়া, পুরীতে অহিন্দুরা সম্ভবত তেমন আরাম পায় না ; সত্যি বলতে কী, তাদের থাকবারই কোনো জায়গা সেখানে নেই, যদি-না রোজ দ্বাদশ মুদ্রা ঢালবার মতো অবস্থা হয়। ফিরিঙ্গিরা তাই এখানে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। হোটেল এবং

ভালো-ভালো বাড়ি যে-ক'টা দেখলুম, প্রায় সবখানেই আধা-ইংরাজের ভিড়। আমরাই এখানে কোণ-ঠাসা।

পুরীর তুলনায় গোপালপুরের সমুদ্র নেহাৎই শান্ত। তেমন উতরোল উচ্ছ্বাস একদিনও দেখলুম না। এ-সমুদ্রে স্নান করায় ক্লান্তি কম, কিন্তু উত্তেজনাও কম, ফুর্তিও কম। ছোটো-ছোটো ঢেউ, তাও এক-একটার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। পুরীতে ক্রমাগত বিরাট ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে-খেয়ে অল্প পরেই হাঁপ ধ'রে যায়। এখানে একটানা ঘণ্টাখানেক স্নান ক'রেও ক্লান্তি হয় না, একটু গা-ব্যথা পর্যন্ত না—সমুদ্রের এতটা ভব্যতা, সত্যি বলতে, তেমন উপভোগ্য ব'লে বোধ হ'লো না। সমুদ্রস্নানের সত্যিকার আনন্দ যারা চায়, তাদের একটু হতাশই হ'তে হয় এখানে।

স্নানের শেষে ফিরে এসে প্রথম কাজ হচ্ছে স্পিরিট ল্যাম্পটি ধরানো। এ-কাজে এরই মধ্যে বিশেষ পারদর্শী হ'য়ে উঠেছি আমি। হাওয়ার জন্য জানলা বন্ধ করতে হয়, তারপর সলতেটি গোপালপুরি ইস্পিরিটে চুপচুপে ভিজিয়ে দেশলাই ধরানো, আস্তে-আস্তে সুন্দর একটি নীল ফুলের মতো ঠাণ্ডা চেহারার নিঃশব্দ আগুন জ্ব'লে ওঠে। দ্বিতীয় বার চা-পান: তারপর মক্ষিরানির রান্না চড়ে। আমার ইচ্ছে ছোটোখাটো সাহায্য করি, কিন্তু পাছে তার ফলে অনর্থই বেড়ে ওঠে সেই ভয়ে রং-চটা জীর্ণ ইজিচেয়ারটায় প'ড়ে কখনো সমুদ্র দেখি, কখনো বা বইয়ের পাতা উল্টোই। খাওয়া হয় খোলা দরজার ধারে সমুদ্র দেখতে-দেখতে; সেকেলে টেবিল-চেয়ার বড্ডই ভারি, দু-জনে মিলে অতি কষ্টে টানাটানি করতে হয়; যে-বাসনে খাই তা ভদ্রসমাজে বের করা যায় না, জল খাওয়া

হয় চায়ের পেয়ালায়। ভদ্রতামাফিক বাসনকোশনের জন্য পাপ্পার কাছে আরজি পেশ করলে অগ্রাহ্য হয় না এ-রকম একটা খবর পেয়েছিলুম ; কিন্তু আমাদের এতেই বেশ চ'লে যাচ্ছিলো।

দুপুরবেলার দিকে মানবিকার দয়া হয় ; তিনি ঘুমোন। সেই সুযোগে মক্ষিরানিও ঘুমিয়ে নেয়। আমি শুয়ে-শুয়ে বই পড়ি ; ক্ষণে-ক্ষণে জানলা দিয়ে চোখে পড়ে বিশাল উজ্জ্বল সমুদ্র, হঠাৎ চমকে উঠে মনে হয় এই প্রথম সমুদ্র দেখলুম। আমি যতদূর জানি, এই পৃথিবীতে সমুদ্রই একমাত্র বস্তু যা দশ মিনিটের ব্যবধানে দেখলেও একেবারে নতুন লাগে। আকাশ রোদে ঝকঝক করে, পশ্চিমের জানলার মোটা শিকের ফাঁক দিয়ে রোদ ঘরে আসে, বিকেল হ'লো বুঝি। একটু হয়তো তন্দ্রা লাগে, চোখ মেলে সিগারেট ধরাই, দরজায় এক বুড়ি ঝিনুক বেচতে এসেছে, হাত নেড়ে তাকে বারণ করি। এরই মধ্যে দ্বিতীয় বার নুলিয়ার আবির্ভাব। স্নান, বিকেলের চা, তারপর ঠাণ্ডা বালুর উপর এসে বসা। ক্রমে সন্ধ্যা নামে, আকাশের অগাধ আলো মিলিয়ে যায়, সবুজ সন্ধ্যাতারা বিশ্বের জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ডের মতো দপদপ করে-- কী মস্ত বড়ো, বিশ্বাস হয় না। বালুর উপর আমাদের ফ্যাকাশে ছায়া পড়েছে, আকাশে আধখানা চাঁদ। এখানে ব'সে আধখানা রাত্রি কাটিয়ে দিতে পারলে তো ভালোই ছিলো ; কিন্তু মানবিকার বুঝি ঘুমের সময় হ'লো, তাছাড়া রান্না আছে। আমাদের দণ্ডাইসি তো সন্ধে হ'তেই বিদেয় নেয়। অতএব উঠতে হয়, ফিরতে হয় ঘরে।

আরো একবার চা ; তারপর বাইরে জ্যোছনা আর ঘরে

হারিকেন লণ্ঠনের ঘোলা আলো নিয়ে কিছুই যেন করবার থাকে না। রোজ সন্ধ্যায় একটি মহাযুদ্ধের পালা ; তারপর মানবিকা ঘুমোন। একটি ছোটো মানুষ ঘুমিয়ে পড়লো ; এই অতি ছোটো ঘটনার মধ্যে যে কত শান্তি, কত আরাম নিহিত আছে তা ভাবতে অবাক লাগে। সাধে কি আর পাড়া জুড়োলো বলেছে ! এদিকেও পাড়া জুড়োয়, বালুবেলা নির্জন হ'য়ে আসে, জ্যোছনা উজ্জ্বল হয়, সমুদ্রের অবিরাম স্বর গম্ভীর হ'য়ে কানে এসে লাগে, চাঁদের আলোয় যেন ঢেউয়ে-ঢেউয়ে খেলা করে রূপকথার অতিকায় সমুদ্র-সর্প। ভাত ঠাণ্ডা ক'রে লাভ নেই, খেয়ে নেয়া যাক। তারপর শুতে যখন যাই রাত ন-টাও বোধহয় বাজেনি। দরজা বন্ধ করলেই গরম লাগে, জানলা দুটো নিজেরা যত ছোটো, শিকগুলো ঠিক সেই অনুপাতেই মোটা-মোটা। পাশের বাড়ির পেট্রোম্যাক্স-জ্বালানো বারান্দায় ইংরেজ পরিবারের কথাবার্তা আনাগোনা শোনা যায়, সেটা নিবে যেতেই অন্ধকার আর সমুদ্রের স্বর ছাড়া কিছুই থাকে না। খাটের অর্ধেক তো জুড়েছেন মানবিকা, বাকি অর্ধেকে আমরা দু-জনে শরীরটাকে নানা কায়দায় বেঁকিয়ে চুরিয়ে কোনোরকমে শুয়ে থাকি। যে-মানুষ সবচেয়ে ছোটো তারই সবচেয়ে বেশি জায়গার প্রয়োজন।

মানবিকার কথা আরো একটু না-বললে এই কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর নিশ্চয়ই ধারণা যে আমরা দু-জন তাঁর বাহন হবার জন্যই এই ধরাধামে এসেছিলুম। যত ধৈর্য, যত সংযম, যত বুদ্ধিবিবেচনা সব এই দাসেদের

জন্য; তিনি তাঁর অফুরন্ত উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালে যখন যা খুশি করবেন। সম্রাজ্ঞীর মতো তাঁর মেজাজ, যখন যেটা চাই সেটা চাই-ই।' তাঁর সুখের ব্যবস্থায় আমরা অহর্নিশ ঘেমে উঠছি: আর লেশমাত্র ত্রুটি হ'লে প্রখর চীৎকারে তিনি প্রবলরূপে আত্মঘোষণা করছেন। যেই একটু ঘুমে আমাদের চোখ লেগে এলো, অমনি কান্নার সুর তোলা তাঁর খেলা। রাত্রে আমাদের বিছানার পাশে টেবিলের উপর থাকে স্পিরিট-ল্যাম্প আর দেশলাই, থাকে দুধের বাটি, থাকে ঘড়ি আর টর্চ—ঠিক সময়মতো তাঁকে খাওয়াতে হয়। খিদে পেলে লোকে সাগ্রহে খায় এটাই আমাদের সাধারণ বুদ্ধির কথা; কিন্তু যে-খাওয়ার জন্য তাঁর কান্না, সেই খাওয়ানো নিয়েই কি কাণ্ডখানা কম! তাছাড়া, কোথায় তাঁর অসুবিধে হচ্ছে সেটা আমাদের মতো নেহাৎই সাবালকের পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয় সব সময়। একদা শেষরাত্রে তাঁর তারস্বরে স্বয়ং পাপ্পা এলো ছুটে। কী ব্যাপার? খোঁকী রোদ্‌তা কেন? কেন? হায়রে, তা যদি জানতুম! মক্ষিরানি রেগে গিয়ে বললে: 'নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তুমি ওকে।' বলামাত্র পাপ্পা লুফে নিলো তাঁকে; তার সুবিস্তৃত বুকের মধ্যে টুকটুকে খুদে মানুষ লেপটে মিশে গিয়েই চুপ। মক্ষিরানিকে ক'ষে ধমকে পাপ্পা চ'লে গেলো মানবিকাকে নিয়ে। দরজা বন্ধ ক'রে ফের শুয়ে পড়লুম, কিন্তু খানিক পরেই আমাকে আবার উঠতে হ'লো। একবার দেখে আসি কোথায় নিয়ে গেলো। অন্ধকার ঘর আর অন্ধকার উঠোন পার হ'য়ে একটা ঘরে গিয়ে দেখি লণ্ঠন জ্বেলে মেঝেতে পা ছড়িয়ে ব'সে পেশীবহুল পাপ্পা তকলিতে সুতো কাটছে, আর পাশেই একটা খাটে

কম্বলমোড়া মানবিকা পরম সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। এরই নাম কৃতজ্ঞতা! আমাদের প্রাণান্ত চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে কিনা এই পাপ্পার কোলে গিয়েই ঘুম! তবে এটা আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি যে মানবিকা শ্রমিকজাতীয় মানুষদের খুব বেশি পছন্দ করেন; তাদের কারো কাছে থাকতে পারলে আর-কিছু তিনি চান না। অভ্যাগত অতিথির প্রসারিত বাহু উপেক্ষা করতে তাঁর ভদ্রতায় বাধে না, কিন্তু কুলি, কাগজওলা, কিংবা ভৃত্যগোছের কেউ হ'লেই কোলে যাবেন ঝাঁপ দিয়ে। তাঁর এই প্রলেটারিয়াট-প্রীতি দুঃসময়ে আমাদের বড়োই কাজে লাগে সে-কথা মানতেই হয়।

পাপ্পা মানুষটা কিন্তু বেশ। প্রথম দর্শনে ভীতি উৎপাদন করে, কিন্তু ক্রমেই ভালো লাগতে থাকে। প্রকাণ্ড কালো শরীর নিয়ে সারাদিন ম্যানেজারি করছে, তার গলার আওয়াজ দু-মাইল দূর থেকে শোনা যায়, স্বামী-পুত্র কেউ নেই, মাইনে পায় আট টাকা মোটে, এদিকে সাতটা জোয়ানের কাজ একাই করে, ইত্যাদি নালিশের কথা ওর মুখে মন্দ লাগে না। বলে হয়তো কপাল চাপড়ে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে এমন বেপরোয়া ফুর্তির ভাব যে বোঝাই যায় মোটের উপর ও আছে ভালো। মুখে ওর সরু মাদ্রাজি চুরুট প্রায়ই দেখা যায়, আমার কাছে সিগারেট চেয়ে নেয় মাঝে-মাঝে, কিন্তু সিগারেটের উপর ওর অশ্রদ্ধা ঘোর। আমাকে বলে—অত সিগ্রেট খেয়ো না বাবু, কলিজা ঝাজরা হ'য়ে যাবে। এক-এক সময় ঘরে এসে অনর্গল কত যে কথা ব'লে যায় সব তার বুঝি না, বোঝার চেষ্টাও করি না। আমাদের চাইতে মানবিকা সম্বন্ধে ওর উৎসাহ

বেশি, কেননা পাপ্পার সব কথায় তিনি মাথা নেড়ে সায় দেন, এবং তার বাংলা-তেলেগু-হিন্দি-মেশানো শব্দপ্রপাতে নিজেও বিনা-ভাষার বিচিত্র ধ্বনিসংযোগ ক'রে চলেন—সেটা বোধ করি পাপ্পার খুব পছন্দ হয়।

মানবিকার কথাটা তাহ'লে শেষ করি। দিদিমাশ্রেণীর এমন কেউ-কেউ আছেন জানি যাঁরা তাঁর বুদ্ধির অসাধারণ উন্মেষে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন; আমার মতটা এ-বিষয়ে কিছু অন্য রকম। সত্যি কথা বলবো, তাঁর বোধশক্তি সম্বন্ধে আমি কিছু হতাশই হয়েছি এবারে। ভেবেছিলুম, সমুদ্র দেখে ইনি আনন্দে উথলে উঠবেন, কিন্তু দুঃখের কথা বলবো কী, সমুদ্রের দিকে এঁর চোখ ফেরানোই গেলো না কখনো। যদি বাইরে নিয়ে গিয়ে বলেছি, দ্যাখো সমুদ্র, ইনি সোজা পিঠ ফিরিয়ে ঘাড়ের উপর মুখ গুঁজলেন। একদিন নিয়ে গেলুম সমুদ্রের জল গায়ে লাগাতে—বাস্‌রে, কী কান্না, ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেলো। অত বড়ো একটা জলজ্বলে সমুদ্র যাঁর মনে কোনোরকম সাড়া তোলে না, বলুন তো তাঁর সৌন্দর্যবোধ কিংবা বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে কোনো উচ্চ ধারণা পোষণ করা কি সম্ভব? এদিকে ভয় আছে টনটনে, বালুর উপরেও বসবেন না, দু-হাতে আঁকড়ে লেপটে থাকবেন কোলে। আমার মনে হয় যে-সব জিনিশ আকারে খুব বড়ো, সেগুলো একেবারে তাঁর ধারণার অতীত; নিকটবর্তী পারিপার্শ্বিকের বাইরে একমাত্র চাঁদেরই প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখেছি, তার কারণ বোধহয় এই যে চাঁদটা দেখতে ছোটো, আর তাই সেটাকে একটা উঁচু দরের খেলনা ব'লে মনে হয় তাঁর। এ ছাড়া, যা-কিছুকে আমরা সুন্দর বলি, আশ্চর্য বলি, সে-সমস্তর

প্রতি এঁর উদাসীনতা অগাধ। সমুদ্র উনি দেখবেন না, কিন্তু খাবার জন্য একটা মুরগি এনে রেখেছিলুম, সেটাকে পেয়ে এঁর কী ফুর্তি! বন্দী কুক্কুটকে ঘিরে নেচে-নেচে যত অদ্ভুত আওয়াজ ইনি মুখে দিয়ে বের করতে লাগলেন তার অনুলিখন এই বর্ণমালার সাহায্যে অসম্ভব। পশুপাখির প্রতি মানবিকার প্রবল অনুরাগ: গোরু কিংবা কুকুর দেখলে তো আত্মহারা। আমি নিজে কোনো মন্তব্য করতে চাই না; কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তি এ থেকে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে এমন অনুমান করতে পারেন যা তাঁর ভক্তদের পক্ষে সুখের হবে না ব'লেই মনে হয়।

স্থ—বাবুরা চ'লে যাচ্ছেন। ভোরবেলায় কলকাতার গাড়ি ধরবেন, শেষরাত্রে বাড়ি থেকে বেরোবেন ঝটকা গাড়িতে। আগের রাত্রে তাঁরা আমাদের ভোজে ডাকলেন। খাওয়া হ'লো আমাদেরই ঘরে; আমাদের অব্যবহৃত ডাইনিংরুমে থালা গেলাশ ডবল লণ্ঠন সাজিয়ে রীতিমতো ভদ্র ভোজ। আমরাও যাই-যাই ভাবে অবস্থান করছিলুম; হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেললুম পরশু সকালের ডাকগাড়িতেই যাবো ওয়াল্টেয়ার। স্থ—বাবুর সঙ্গী পরামর্শ দিলেন—রাত্রের প্যাসেঞ্জার গাড়িতে চ'লে যান, সকালে বেরোলেও ওরা পুরো একদিনের ভাড়া নেবে। মনে লাগলো কথাটা। টাইমটেবিল খোলা হ'লো—ঠিক ভোরবেলায় ওয়াল্টেয়ার পৌঁছনো যাবে। ভালো। স্থ—বাবু অনেক দেশ বেড়িয়েছেন, তাঁর কাছে খবর মিললো ওয়াল্টেয়ারে ফিরোজ ম্যানশন্স

নামে অতিথিশালা আছে সমুদ্রের ধারে, সেখানে আহারাদিও মেলে। শুনে নিশ্চিন্ত বোধ করলুম। স্পিরিট-ল্যাম্প নিয়ে রান্না-রান্না খেলার ফুর্তিতে এ-ক'দিনে মন্দা ধরেছিলো, সত্যি বলতে; চাওয়ামাত্র খাওয়া জুটবে এমন কোথাও যেতে পারলেই এখন খুশি হই।

শেষরাত্রে সু—বাবুরা আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে বাইরে গেলুম, রাস্তায় ঝটকা দাঁড়িয়ে। চেহারাটা গোরুর গাড়ির, টানে একটা ঘোড়া, তারই নাম ঝটকা। এই যানের খুব প্রচলন এ-অঞ্চলে। এই ঝটকাটাই ওঁরা ঠিক ক'রে দিলেন, কাল বিকেলে এসে আমাদের বহরমপুর স্টেশনে নিয়ে যাবে, 'কিরায়া' পাঁচ সিকে। এক ঘণ্টায় পৌঁছে দেবে, তবে ওঁরা ব'লে গেলেন আমরা যেন বেলাবেলিই বেরুই, স্টেশনে ব'সে থাকতে হ'লে দোষ কী? গাড়ি ঠিক আসবে।

তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে আবার এসে ঘুমোলাম। একটা জাহাজের ডেকে ব'সে আছি, জাহাজ যাচ্ছে রেঙ্গুন। অথচ সঙ্গে আমাদের ওয়াল্ট্যায়ারের ট্রেনের টিকিট। তাই তো, কী হবে। স্বপ্নের মধ্যে এই দুশ্চিন্তা অসহ্য হ'য়ে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে জানলা দিয়ে চোখ গেলো বাইরে—আরে, সত্যি একটা জাহাজ এসে দাঁড়িয়েছে যে। দু-দিন আগে আর-একটা এসেছিলো, সেটা যাচ্ছিলো কোকনদ থেকে রেঙ্গুন। আজকের জাহাজ উল্টো পথের, আসছে রেঙ্গুন থেকে। গোপালপুরে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, নৌকো ক'রে যাত্রীরা নামে ওঠে। আসলে এরা

মালের জাহাজ, মজুরশ্রেণীর যাত্রীও যায় কিছু-কিছু, ভাড়া খুব শস্তা।

বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে দিলাম। দেখি, আকাশ মেঘে ঢাকা, গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ছী-ছি, এ-সময়ে আবার বৃষ্টি কেন? এ-ব্যাপারটা অলীক এবং ক্ষণিক, আমার জাহাজের দুঃস্বপ্নেরই মতো; শিগগিরই কেটে গিয়ে সূর্য দেখা দেবে—মনে-মনে নিজেকে এই ব'লে আশ্বাস দিয়ে স্পিরিটল্যাম্প ধরালাম। মক্ষিরানিকে অবাক ক'রে দেবো আজ। জল ফুটিয়ে চা করলাম, ডিম সেদ্ধ করলাম; একেবারে ছোটো হাজরি সাজিয়ে বেশ গর্বভরেই ডেকে তুললাম মক্ষিরানিকে। সত্যের খাতিরে বলতেই হবে, অমন চমৎকার চা খাওয়া সচরাচর মানুষের ভাগ্যে ঘটে না।

বেলা বাড়লো, আকাশের মুখ বদলালো না। ক-টা দিন এমন চমৎকার কাটিয়ে যাবার দিনে এ কী অনাসৃষ্টি! সমুদ্রটা ছাইরঙে আর বাদামিরঙে মিশে ঘোলাটে; আকাশ যেন পাৎলা শিষের পাতে মোড়া; মাঝে-মাঝে একটু ফ্যাকাশে রোদের আভা যদি-বা দেখা দেয়, পরক্ষণেই মুছে যায় আমাদের হৃদয়ের আশা নিবিয়ে দিয়ে।

আশায়-আশায় ব'সে থেকে যখন বুঝতে পারলুম যে রোদ আর উঠবে না, তখন গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই সমুদ্রে দুটো ডুব দিয়ে এলুম। মক্ষিরানি আজ স্নানের ঘরেরই শরণ নিলেন; একে বাদলা, তার উপর তিনি আজ ব্যস্ত, জিনিশ গুছোবার পালা আছে।

বেলা দুপুর। জাহাজটা এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে

ভিজেছে, আর অবিরল ধোঁয়া উগরেছে চোঙ দিয়ে। সাধারণ মালের জাহাজ দেখতে কিছু মনোহর নয়, খানিক বাদে তার উপস্থিতিটাই ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে তাকিয়ে দেখি, সে তো চলেছে। চলেছে কোণাকুণি দক্ষিণ দিকে, এই মেঘে বৃষ্টিতে বিশাল সমুদ্রের বুক চিরে কী নির্ভীক, কী বলশালী তার গতি। ঘরে ব'সে দেখতে-দেখতে আমার যেন একটু-একটু ভয়ই করছিলো। উড়ছে ধোঁয়ার নিশেন, জাহাজটি আড় হ'য়ে এগিয়ে চলেছে—অন্তহীন সমুদ্রের মধ্যে কী প্রচণ্ড ওর ভরসা। স্বয়ং রাজা সলোমন সমুদ্রের উপর জাহাজের গতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, আর আমি তো কোন ছার। এত বড়ো ভয়ংকর সমুদ্র কিনা একা চ'ষে বেড়াচ্ছে ঐ ছোট্ট জাহাজ। দেখতে-দেখতে সে দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তে একটা ছোট্ট কালো ফুটকি হ'য়ে বিঁধে থাকলো আমাদের চোখে, তারপর শুধু একটু ধোঁয়া, তারপর ধোঁয়াও মিলিয়ে গিয়ে বাদামি-ধূসর সমুদ্র শুধু প'ড়ে থাকলো।

তিনটের পরেই আমাদের ঝটকা এসে উপস্থিত। বাঁধাছাঁদা প্রায় শেষ, তাড়াতাড়ি একটু চা খেয়ে নিয়ে তৈরি হওয়া গেলো। কিন্তু এত আগেই বেরোবো কী! সেই রাত ন-টায় বুঝি গাড়ি। এদিকে আকাশের অবস্থা ভালো না, বৃষ্টির জোর বাড়তে পারে, দিনের আলো থাকতে-থাকতেই বেরোনো ভালো। তা-ই হোক তবে। বকশিশ বিতরণের পালা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করলুম—এতগুলো মানুষের সেবা এই পাঁচ দিন ধ'রে ভোগ করেছি, এর আগে তা কিন্তু জানতে পারিনি। ঝটকা ব্যাপারটা ছোটো একটুখানি,

মালপত্রেই ভ'রে গেছে, বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে অতি কষ্টে তারই মধ্যে উঠে বসলাম। ওরা সব আছে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে; পাপ্পা বললে—'হেঁই মা, খোঁকি কেমন থাকে চিঠি লিখো। খোঁকির কথা লিখো।'

প্যাসেঞ্জার গাড়ি

আমরাও রওনা হলাম, বৃষ্টিও বেশ ভালোরকম নামলো। একজনের বসবার পক্ষেও যথেষ্ট নয় যে-জায়গা, তার মধ্যে আমরা দু-জন মানবিকাকে নিয়ে বসেছি--সার্কাসের কসরতের চাইতে এটাকে কম ব'লে মানতে পারি না। মালপত্র সামনের দিকে, আমরা পিছনে; ঝটকাযানের তা-ই দস্তুর। আমি ধরেছি ছাতা খুলে, মক্ষিরানি সামলাচ্ছে মানবিকাকে। বৃষ্টির ছাঁট তবু মাঝে-মাঝে গায়ে লাগছে, তবে সারা পথ মানবিকার মেজাজটি যে ভালো ছিলো সেটাই ঈশ্বরের দয়া ব'লে গণ্য করি।

উঁচু-নিচু পথে ঝকরঝকর ঝটকা চলেছে। কখনো চামড়ার ছোটো বাক্সটা পড়ছে গড়িয়ে, কখনো তারের খাঁচা থেকে বেরিয়ে সসপ্যানের হাতলটা মাথায় দিচ্ছে খোঁচা। সারাক্ষণ সামাল-সামাল। এদিকে নড়তে গেলেই মনে হয় যে হাত-পাগুলোকে ভাঁজে-ভাজে খুলে নেবার ব্যবস্থা থাকলে ভালো হ'তো। সান্ত্বনার মধ্যে চকোলেট আর কমলালেবু, মানবিকা মেজাজ বিগড়োবার ক্ষুদ্রতম লক্ষণ দেখানোমাত্র তাঁর মুখে পুরে দেয়া হচ্ছে চকোলেট। রাস্তায় মাঝে-মাঝে গোরুর পাল চলেছে ভিজতে-ভিজতে, মানবিকা গলা বাড়িয়ে ভো-ভো চীৎকারে তাদের সম্ভাষণ জানাচ্ছেন; চলেছে উলঙ্গ এবং অর্ধ-উলঙ্গ অতি শীর্ণ নানা বয়সের শিশু, মাঝে-মাঝে আমাদের বুক কাঁপিয়ে দু-একটা মোটরযানও যাচ্ছে। এখানে একটা ছোটো পাহাড়মতো, ওখানে জল, মাঝে-মাঝে দশ-বিশটা বাড়ি গায়ে-গা-লাগা—কী নাম এ-গ্রামের কে জানে—তারপর

খানিকটা খেত, খানিকটা জঙ্গল, এমনি ক'রে চলেছে আমাদের পথ। মেঘলা আকাশে আলো ক'মে আসছে, ঝটকা চলছে ঝকরঝকর।

এর পর এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে আমরা আস্ত শরীর নিয়েই বহরমপুর স্টেশনে পৌঁচেছিলুম। একবার মক্ষিরানির এক পাটি জুতো রাস্তায় প'ড়ে গিয়েছিলো, এবং আমি তৎক্ষণাৎ সেটিকে পঙ্কশয্যা থেকে উদ্ধার করেছিলুম, এর বেশি কোনো বিভ্রাট ঘটেনি। তখন ঠিক সন্ধ্যা। মালপত্র নামিয়ে রাখা হ'লো স্টেশনের বারান্দায়, একজন কুলিকে তার পাহারায় রেখে আমাদের দৌড় রিফ্রেশমেণ্টরুমের দিকে। এ-প্রসঙ্গে এটুকুও বলতে হবে যে মানবিকাকেও সেই কুলির কোলে চাপিয়েছিলুম, নয়তো চা খাওয়া অসম্ভব হ'তো। কুলিরা সাধারণত যে-সব জিনিশ বহন করে তার তুলনায় মানবিকা খুব হালকা তো বটেই, কিছু সরসও হবেন বোধ করি, কুলি তো দেখলুম ওকে নিয়ে পরমানন্দে চ'লে গেলো। খানিক পরে চা ফেলে উঠে গেলুম ভাবটা দেখতে। দেখি টিকিটঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কুলি মানবিকাকে ঐ ঘরেরই রহস্যটা বোঝাচ্ছে বোধহয়, আর মানবিকা হাতে একখানা গোল বিস্কুট নিয়ে তা-তা-না-না ক'রে গান গাইছেন। বিস্কুটখানা তাঁর বর্তমান বাহনেরই উপহার তাতে সন্দেহ নেই।

দীর্ঘ অপেক্ষা। অন্ধকারে বড়ো বিছানাটার উপর ব'সে আছি। বৃষ্টি থেমেছে, মেঘলা আকাশে চুঁইয়ে পড়ছে পাণ্ডুর একটু চাঁদের আলো। মানবিকা কখনো কুলির কোলে বেড়াচ্ছেন, কখনো আমাদের মাঝখানে এসে দু-মিনিটের মধ্যে

উভয়কেই অস্থির ক'রে তুলেছেন। তাঁর কোনো ভাবনা নেই, সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁর খেলাঘর। আমি মাঝে-মাঝে হাঁটছি, ঘুরছি, সিগারেট খাচ্ছি, ফের এসে বসছি। এতক্ষণে আরো ঢের লোক এসেছে স্টেশনে, খানিক বাদে ডাউন মান্দ্রাজ মেল আসবে। ইতিমধ্যে আমাদের একঘেয়ে অপেক্ষায় একটু উত্তেজনা ঘটলো একটা কুকুরের আবির্ভাবে। এই জীবটিকে দেখামাত্র মানবিকা অতিশয় চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। যাবেনই তিনি কাছে, কিছুতেই থামানো যায় না। অগত্যা কুকুরের সঙ্গে দিতে হ'লো তাঁর ভাব করিয়ে। সঙ্গে আমাদের একটা পাঁউরুটি ছিলো—রাত্রে গাড়িতে খাবো ব'লে এনেছিলাম—সেটা ছিঁড়ে অতিথিকে একটু দিলুম বন্ধুতার প্রমাণস্বরূপ। প্রমাণটা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিলো সন্দেহ নেই, কেননা তারপর থেকে আমাদের সান্নিধ্য সে আর ছাড়ে না। খানিক পরে হঠাৎ দেখি আস্ত পাঁউরুটিটাই অদৃশ্য হয়েছে। এ যে মানবিকার নতুন বন্ধুরই কাজ সেটা বুঝতে গবেষণার প্রয়োজন হ'লো না। খুব বেশি দুঃখিত হলুম সে-কথাও বলতে পারি না; বেশ ভালো ছিলো কুকুরটা।

মান্দ্রাজ মেল এলো, দাঁড়ালো, চ'লে গেলো। কয়েক মিনিটের জন্য ঝলমল ক'রে উঠলো স্টেশন; তারপর পাংশু জ্যোছনায় হা-হা ক'রে উঠলো সত্যবিধবার মতো। একটু আগেই খুলেছিলো বইয়ের স্টলটা, এইবারে পাট বন্ধ ক'রে হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে লোকটি চ'লে গেলো। প্রায় তিন ঘণ্টা আমরা অপেক্ষা করেছি, আরো ঘণ্টাখানেক বাকি। মক্ষিরানির আশ্রয় জুটলো মেয়েদের সেকেণ্ড কেলাশ অপেক্ষাগৃহে, আমি রি-রু থেকে আর-এক পেয়ালা চা আনিয়ে খেয়ে মানবিকাকে

ঘাড়ে ক'রে শূন্য প্ল্যাটফরমে পাইচারি করতে লাগলুম। শরীরের কষ্ট যথেষ্টই হচ্ছে, তবু আমি একটুও ক্লান্ত বোধ করছিলুম না। বরং আমার খুব সুস্থ, খুব ভালোই লাগছিলো, সেই শূন্য প্ল্যাটফরমে পাইচারি করতে-করতে, আকাশের তলায়, নীলচে ফ্যাকাশে ক্ষীণ একটু চাঁদের আলোয়। যে-অবস্থায় মানুষের গলা দিয়ে আপনা থেকেই গুনগুনানি গান বেরোয়, সেই অবস্থা তখন আমার মনের।

মানবিকা ঘুমোলেন, এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরও মেয়াদ ফুরোলো। ঘণ্টা বাজলো, গাড়ি এসে দাঁড়ালো; হাতের কাছে যে-ইণ্টার ক্লাশটা পেলুম ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে তাতেই উঠে পড়লুম আমরা। সেটাই বোধহয় ভুল হয়েছিলো। কেননা কামরাটি ভর্তি, আড়াই জনে একটি বেঞ্চ দখল ক'রেই ধন্য বোধ করলুম। বিছানা পেতে মানবিকাকে আগে শোয়াও তো, তারপর দেখা যাবে। আমাদের চার ঘণ্টার বন্ধু দুই কুলি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের সাহায্যে ব্যস্ত। আট আনা ক'রে দিলুম ওদের। কাউকে পয়সা দিয়ে এত খুশি কখনো লাগেনি। এ-অঞ্চলের কুলিরা খুব ভালো এ-কথা আমাকে বলতেই হবে।

গাড়ি চলেছে। মক্ষিরানি শুয়েছে অতি কষ্টে, আমি আছি ব'সে। কামড়ায় ভিড় বলেছিলুম, কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা অন্যায়রকম বেশি নয়। একটানা লম্বা বেঞ্চিটায় দু-তিনজন স্ত্রীলোক যতটা সম্ভব তারও বেশি জায়গা জুড়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, আর একজন গোঁফওলা পুরুষ মধ্যিখানে ব'সে আছে পাহারায়। আরো কয়েকটা ছোটো বেঞ্চি এমনি এক-একটি স্ত্রীলোক কর্তৃক অধিকৃত। চেহারা দেখে তাদের দেড়ামাশুল-

ধাবী মনে হচ্ছে না। সন্দেহের দৃষ্টিতে ঘন-ঘন তাকাচ্ছি, যত দেখছি ততই সন্দেহ দৃঢ় হচ্ছে। বাঙ্কের উপরেও আছে ওদের দল, শিশু এবং বৃদ্ধ—শুধু শারীরিক সম্প্রসারণশক্তিতেই পুরো কামরাটি রিজর্ভ ক'রে নিয়েছে এরা। অন্যায়ভাবে জায়গা যারা দখল করেছে তারা সকলেই অবলা, অতএব আমাকেও অপ্রতিবাদে অ-বলা হ'য়ে থাকতে হবে। নীরবে মেরুদণ্ডের টনটনানি সহ্য করতে লাগলুম।

প্রত্যেক স্টেশনে থেমে-থেমে চলছে গাড়ি। আমি কখনো ওরই মধ্যে একটু শুয়ে নেবার চেষ্টা করছি, সেটা সম্ভব নয় বুঝে একটু পরেই উঠে ব'সে ধরাচ্ছি সিগারেট, মক্ষিরানিও থেকে-থেকে জেগে উঠছে, এমনি ক'রে কাটছে আমাদের সময়। একবার একজন চেকার উঠলো, আমাদের প্রাণ লাফিয়ে উঠলো আনন্দে। এইবার তো ওরা ধরা পড়বে, দেবে সকলকে নামিয়ে···ন্যায়ধর্ম পালনে হঠাৎ কেমন অসাধারণ উৎসাহ অনুভব করলুম। কিন্তু সে-উৎসাহ দপ ক'রে নিবে গেলো, যখন, রেলপুরুষ কাছে আসতে, গোঁফওলাটি পকেট থেকে বের করলেন, টিকিট নয়, একটু করো কাগজ। বুঝলুম, তিনি নিজেও একজন রেলপুরুষ; বৃহৎ পরিবার নিয়ে পাশে চলেছেন। ন্যায্য অধিকারেই ওরা সারা কামরা জুড়েছে; আমরা যারা নেহাৎই টিকিটধারী হ'য়েও এখানে প্রবেশ করেছি—আমরা যে বসবার জায়গাটুকু পেয়েছি এই তো যথেষ্ট।

আজকের রাত ব'সে-ব'সেই কাটাতে হবে সেটা একবার যখন মেনে নিলুম, তখন আর অত খারাপ লাগলো না। বারোটা বাজলো, একটা বাজলো। ঢিকশ-ঢিকশ গাড়ি চলেছে, কখনো একটু ভালোরকম দৌড়লো কি অমনি এলো

ইস্টেশন। স্টেশনগুলোর নাম পড়ার মতো উৎসাহ এখন আর আমাদের নেই। ঠাণ্ডার জন্য কামারার সব জানলা তোলা ; বাইরের কিছুই চোখে পড়ছে না আমাদের ; মাঝে-মাঝে কাচের শার্সিতে নিজেদেরই চলন্ত প্রতিচ্ছবি শুধু দেখা যাচ্ছে। রেলবাবুর স্ত্রীলোকগণ নাকমুখসুদ্ধ ময়লা কাপড়ে ঢেকে এমন অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছেন যে হঠাৎ দেখে ঠাহর হয় না এঁরা লগেজ না মানুষ। মক্ষিরানিও উঠে বসেছে ; আর কয়েক ঘণ্টা পরেই নতুন সমুদ্র দেখতে-দেখতে আমরা ভোরবেলার চা খাচ্ছি, এই কথা বলাবলি ক'রে পরস্পরকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিচ্ছি আমরা। এমন সময় ধুপ ক'রে একটা শব্দ হ'লো। তাকিয়ে দেখি, আমাদের পাশের বেঞ্চিতে পাশ-বাবুর অন্যতম স্ত্রী-জাতীয় জীব, যিনি বেহুঁশ হ'য়ে সারাক্ষণ ঘুমুচ্ছিলেন, তিনি গেছেন মেঝেতে প'ড়ে। পড়েছেন তো পড়েছেন, ওঠবার লক্ষণমাত্র নেই। ঘুমের ব্যাঘাত হবে কেন, সরু বেঞ্চি থেকে প্রশস্ত মেঝেতে আশ্রয় পেয়ে তাঁর সুবিস্তৃত অবয়বের বরং আরাম হবারই কথা। লম্বা বেঞ্চি থেকে এক বুড়ি মিটমিটে চোখে তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখছে আর গাল তুবড়িয়ে হাসছে। ছোটো একটি মেয়ে ঐ বেঞ্চিতেই শুয়ে ছিলো, তার বোধহয় বিশেষ আরাম হচ্ছিলো না, সে এই সুযোগে তাড়াতাড়ি উঠে শূন্য বেঞ্চিটায় লম্বা হ'য়ে ঘুম লাগালো। ব্যাপারটা ততক্ষণে ওদের দলের অনেকেরই নজরে এসেছে ; যে যার জায়গায় শুয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছে ওরা। অধঃপতিতাকে কেউ উদ্ধার করবে এমন কোনো লক্ষণই দেখলুম না। কিন্তু খানিক পরে মেঝের উপর হাত-পা

ছড়ানো সেই প্রকাণ্ড শরীর নিজে থেকেই ন'ড়ে উঠলো, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে অবস্থাটা বুঝতে পেরেই সে করলে কী, এক টানে ছোটো মেয়েটাকে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে আবার শুয়ে পড়লো লম্বা হ'য়ে নিজস্ব জায়গায়। মেয়েটা ঘুমের ঘোরে 'আম্মা আম্মা' ব'লে কেঁদে উঠে ফের শুয়ে পড়লো সেই বেঞ্চিতেই পায়ের কাছে কুঁকড়ে। ঐ নিদ্রালু নিক্ষেপকারিণী মহিলাই যে সম্ভবত তার মা, এটাই বোধহয় এই ঘটনার সবচেয়ে চমকপ্রদ অংশ। ইণ্টের ক্লাশে জেগে ব'সে রাত কাটাবার একেবারেই যে কোনো পুরস্কার না জোটে তা নয়।

দুটো বাজলো, তিনটে বাজলো, পথ ফুরিয়ে আসছে। গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে বাইরে শোনা যাচ্ছে ঝমঝম শব্দ। হায়রে, বৃষ্টি কি আমাদের তাড়া করবে গোপালপুর থেকে ওয়াল্ট্যায়ার? প্রাণপণে আশা করতে লাগলুম যে এ-বৃষ্টি স্থানীয়, ওয়াল্ট্যায়ার পর্যন্ত পৌঁছয়নি---অন্তত আর দু-তিনঘণ্টার মধ্যে থেমে যাবেই; কিন্তু মনের মধ্যে খুব যেন ভরসা পেলুম না। গাড়ি চলেছে, বৃষ্টিও চলেছে সঙ্গে-সঙ্গে; এ-বৃষ্টি যেন রেলগাড়ির চেয়েও দ্রুতগামী, অনেক আগেই সমস্ত দেশ দখল ক'রে নিয়েছে। গাড়ি যত এগোচ্ছে, বৃষ্টির তোড় ততই যেন বাড়ছে। ধুকধুক-বুকে ব'সে আছি আমরা; ধৈর্য ছাড়া উপায় নেই। একবার দেখছি টাইমটেবিল, একবার দেখছি ঘড়ি। সময় হ'য়ে এলো।

এ-গাড়ির নাম পুরী-ভাইজাগ প্যাসেঞ্জার; শেষ স্টেশন ওয়াল্ট্যায়ার। সুতরাং নামবার জন্য তাড়া নেই। বিছানাপত্র

আর নানা টুকরো জিনিশ চারদিকে ছড়িয়ে আমরা নিশ্চিন্তে ব'সে আছি। সারারাত অঘোরে যারা নিদ্রা গেছে, তারা এইবার আস্তে-আস্তে জেগে উঠে বসছে। এমনকি, বেঞ্চি থেকে প'ড়ে গিয়েও যার ঘুম ভাঙেনি, সে-ও উঠলো। কামরাতে বাঁধাছাদা গোছগাছ চলেছে, পরের স্টেশনই ওয়াল্‌ট্যায়ার।

তখনো রাতের অন্ধকার থমথম করছে। বাইরে তাকিয়ে দেখলুম, শহরের চওড়া বাঁধানো রাস্তা শূন্য প'ড়ে আছে, আর চারদিকে ইলেকট্রিক আলো ছিটোনো। আর বৃষ্টি। ঝম-ঝম!

ওয়াল্‌ট্যায়ার এলো। সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টিও এলো ভয়ানক বেগে। এরই মধ্যে নামতে হবে কোনোরকমে, যতক্ষণ ভোরের আলো না ফোটে স্টেশনেই কাটাবো আরকি। আমরা ছাড়া সব যাত্রীরা চটপট নেমে গেলো, একটি মান্দ্রাজি যুবক শুধু রইলো। কুলি গেছে প্রথমে সুটকেসটা নিয়ে, ফিরে এসে বাকি মাল নেবে, আমরাও যাবো সেই সঙ্গে। এমন সময় হঠাৎ গাড়িটা ন'ড়ে উঠলো, আর মান্দ্রাজি যুবকটি ব'লে উঠলো, 'Be very careful.' সঙ্গে-সঙ্গে দেখি, আমাদের কুলি দৌড়ে এসে তার কুর্তার নম্বর দেখিয়ে গাড়ির পা-দানি থেকে নেমে গেলো।

ব্যাপার কী? গাড়ি তো আবার চলেছে! আমরা কিছু জিগেস করার আগেই মান্দ্রাজি যুবকটি বললো—'গাড়ি যাচ্ছে ভাইজাগ স্টেশনে, সেখান থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার ওয়াল্‌ট্যায়ার ফিরে আসবে, কোনো ভাবনা নেই। সুটকেস ঠিক আছে।' ফিরে আসবে তো ঠিক? টাইমটেবিল খুলে বুঝলুম একটু পরে ইনিই আবার যাত্রা করবেন পুরীর দিকে। ব'সে রইলুম চুপ ক'রে; এখন ঢের

শোবার জায়গা, কিন্তু শুতে আর মন নেই। মিনিট কয়েক পরেই গাড়ি আবার থামলো। ছোট্ট, অন্ধকার ভিজগাপটাম স্টেশন। সমানে বৃষ্টি চলেছে। হু-হু হাওয়া। একটা শো-শো শব্দ কানে লাগছে অবিরাম। মান্দ্রাজি বন্ধুকে জিগেস করলুম, 'এ কি সমুদ্র?' জবাব হ'লো, 'হাওয়াও আছে।' 'এখানে কি খুব ঝড়বৃষ্টি হয় এ-সময়ে?' 'হয়। আরম্ভ হ'লে সাত দিনের আগে থামে না।' ব'লে বেশ প্রফুল্লচিত্তে মান্দ্রাজিটি নেমে গেলো। গাড়িতে আমরা একা, ব'সে-ব'সে শুনছি হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ, বাইরে বৃষ্টি আর অন্ধকার।

আরে, গাড়ি আবার চলছে যে! ঠিক, উল্টোদিকেই তো চলেছে! এত শিগগিরই আবার চলতে শুরু করবে, তা কিন্তু আশাই করিনি আমরা। ফিরে এলাম ওয়াল্ট্যায়ার স্টেশনে, এইমাত্র ধূসর বিষণ্ণ ক্ষীণ একটু আলো ফুটলো। এই নাকি ভোর! এর চেয়ে অন্ধকারও যে ভালো ছিলো। বড্ড দ'মে গেলো মনটা।

ভিজতে-ভিজতে এলো আমাদের কুলি, তবু একটু আশ্বস্ত বোধ করলুম। এবার যেখানে গাড়ি দাঁড়িয়েছে সেখানে প্ল্যাটফরম নেই। ক্ষুদ্র একটি মানবিকাকে নিয়ে ঐ বৃষ্টিতে আমরা যে কী ক'রে নামলুম, নেমে সরু একটি তক্তার উপর দিয়ে একটা লাইন পার হ'য়ে স্টেশনে গিয়ে পৌছলুম, তা ভাবতে অবাকই লাগে এখন। এতে এটা প্রমাণ হয় যে সত্যি-সত্যি বিপাকে পড়লে সবই প্রায় পেরে ওঠা যায়, যত ভয় সব আগে কিংবা পরে। ছাতা কোট ইত্যাদি সত্ত্বেও রীতিমতোই ভিজে গেলুম আমরা—মানবিকা সুদ্ধু বাদ গেলেন না—কিন্তু

যে-কোনো স্থানে নিরাপদে যে পৌঁছতে পেরেছি, তারই আনন্দে ভেজাটাকে কিছু মনেই করলুম না।

প্রথম কাজ স্টেশন-মাস্টারের ঘরে গিয়ে সুটকেস উদ্ধার। মালপত্র সব এক জায়গায় জড়ো ক'রে রাখো, তারপর চলো রিফ্রেশমেণ্ট রুমে। চা ভিন্ন এখন আর অন্য চিন্তা নেই আমাদের। স্টেশনের বারান্দা ভিড়ে গিশগিশ করছে, পা ফেলার জায়গা নেই। কোনোরকমে আসা তো গেলো, কিন্তু রি-রুর দরজা এখনো খোলেনি। ধাক্কা দিয়ে খুলে একরকম জোর ক'রেই ভিতরে গিয়ে বসলুম। চায়ের দেরি হবে। তা হোক, আমরা নড়ছি না। 'গোরুর দুধ এখনো আসেনি, টিনের দুধে খেলে এখনই দিতে পারি,' ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে ওরা বললো। বেশ, তাতেই রাজি। মানবিকাকে কোলে নিয়ে ছোকরা কুলি বাইরে চ'লে গেলো। যতক্ষণ আমরা ছিলুম ওখানে—দু-ঘণ্টার কম হবে না—মানবিকা আগাগোড়া কুলির কোলে। এ-ব্যবস্থায় এবারেও আপত্তি দেখলুম না মানবিকার, কুলিরও না; দু-জনেই খুশি এবং তাদের খুশিতে আমরাও বেশ খুশি হ'তে পেরেছিলুম, সে-কথা বোধহয় না-বললেও চলে।

এতক্ষণে ভালো ক'রে আলো ফুটেছে। সামনেই উঁচু হ'য়ে উঠেছে নীল একটা পাহাড়, দূরে দেখা যাচ্ছে আরো পাহাড়ের রেখা। কী সুন্দরই না লাগতো এই শহর, এই ভোরবেলায়, যদি না এমন ঝর্ঝর বৃষ্টি নামতো। থামবার কোনো লক্ষণই নেই। চা খেতে-খেতে খানসামাদের জিগেস করলুম, ওরাও বললো এখানে বৃষ্টি নামলে সাত দিন না হোক তিন-চারদিন একটানা চলেই। সর্বনাশ! কোন সুখে যে মানুষ বাড়ি থেকে বেরোয়! তবে ওরা এটুকু আশা দিলো যে দু-দিন ধ'রে এই

ব্যাপার যখন চলছে, কাল হয়তো আকাশের মুখ বদলাতেও পারে।

খোঁজ নিয়ে জানলুম স্টেশনে কোনো ট্যাক্সি নেই, টেলিফোন করলেও এই বৃষ্টিতে কেউ আসবে না। স্টেশনের কর্তারা বললেন, 'ঝটকা নিয়ে চ'লে যান, দু-মাইল পথ আধ ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দেবে।' আবার ঝটকা! দেরি করতে লাগলুম। একটা দক্ষিণের গাড়ি এলো, স্টেশনের সমস্তটা ভিড় গিলে নিয়ে চ'লে গেলো। আমাদের কুলি খবর দিলো তার ডিউটির সময় ফুরিয়েছে।

ঝড় বৃষ্টি যা-ই হোক, রিফ্রেশমেণ্টরুমে ব'সে সারাটা দিন তো আর কাটানো যাবে না। উঠতেই হ'লো। অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত হবার ফলে এবারে দুটো ঝটকা ঠিক করলুম। একটায় যাবে মাল, অন্যটায় আমরা। কুলি বললে—'আমি যাবো মালের গাড়ির সঙ্গে, মালপত্র সব নামিয়ে গুছিয়ে ঠিক ক'রে দেবো?' নিছক বকশিশের লোভেই সে ও-কথা বলেনি – আমাদের তো তা-ই মনে হ'লো। কিন্তু আমরা ওখানেই বিদায় নিলুম তার কাছে। ও বললে—'যাবার দিন আমাকেই নিয়ো। চেহারাটা চিনে রাখো।'

ঝটকার পিছন দিকে ব'সে শহর দেখতে-দেখতে চলেছি; জলের ছাঁট লাগছে গায়ে। যেদিকে চোখ ফেরাই, পাহাড়, আরো পাহাড়। সুন্দর শহর নিশ্চয়ই, ঈশ্বরের দয়ায় একটা দিনের জন্যও যেন সূর্য ওঠে। আপাতত ফিরোজ ম্যানশন্স-এ উঠে স্নান ক'রে পরিষ্কার শুকনো কাপড় প'রে কিছু ভদ্র গোছের আহার্য যদি পাই, সেটাও কম দয়া ব'লে মানবো না।···কিন্তু আমাদের দুঃখের যে সবেমাত্র আরম্ভ, তা কি তখন জানতুম!

ফিরোজ ম্যানশন্স

বিশ্রী কাদামাখা পথ, জীর্ণ কুৎসিত বাড়ি দু-দিকে···তারই মধ্যে আমাদের ঝটকা হঠাৎ এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো। কী হ'লো ? আয়া। আয়া ? এই নাকি ফিরোজ ম্যানশন্স, এতখানি দুঃখের পথ যার নাম জপতে-জপতে পার হয়েছি ? রং-চটা জীর্ণ একটা দোতলা বাড়ি, অতি অভাগার মতো দেখতে, এর ভিতরে যে কোনোরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পাবে তা কল্পনা করাও যায় না। তাছাড়া, সমুদ্র কোথায় ? শুনেছিলাম সমুদ্রের উপর বাড়ি, বুজরকি নাকি সেটাও ? এ যে দেখছি মফস্বল শহরের অভ্যন্তরের মতো অকপট কুশ্রীতা। গাড়ি থেকে নামতে পা আর সরে না। আর-কোনো হোটেল নেই ? ঝটকাওলা বললো, সায়েবদের সী-ভিউ হোটেল আছে, এখান থেকে তিন মাইল। আর ? ওরা মাথা নাড়লো। ই তো পিরোজ ম্যানশন্স হায়, ই তো আচ্ছা হায়। কী আর করি, আপাতত এখানেই উঠি তো। যদি এই শহরে দু-চারদিন অবস্থান কপালে থাকেই, পরে না-হয় ভালো দেখে একটা আস্তানা খুঁজে নেবো।

আর-এক প্রস্থ ভিজে ঐ বাড়িতেই তো ওঠা গেলো। চারদিক স্যাঁৎসেঁতে, নোংরা, উঠোনে কয়েকটা মুরগি চরছে—মলিন দীনতার মন-খারাপ-করা ছবি যেন। এক দাড়িওলা লুঙ্গি-পরা আধ-বুড়ো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাদের নিরীক্ষণ করছে, তারই কাছে গিয়ে কথা পাড়লুম ইংরেজিতে। সে মাথা নেড়ে বললে : 'উর্দুমে বাৎ করো।' শোনামাত্র মন-মেজাজ বিগড়ে গেলো। মনে হ'লো, যে-লোকটা ইংরেজি জানে না,

সে এখানে দাঁড়িয়ে আছে কোন অধিকারে? রাত জেগে, বৃষ্টিতে ভিজে, ছোটোখাটো একটি দুর্ঘটনা কাটিয়ে, এই ফিরোজ ম্যানশন্সে আমাদের পৌঁছনোটাই কি যথেষ্ট নয় যে তার উপর আবার চারটে ক'রে ভাষা জানতে হবে? রাগ ক'রে কী আর করি, এ-ক'দিনে হিন্দি যেটুকু রপ্ত হয়েছিলো তা-ই ফুলস্টীম চালিয়ে দিলাম। চাবির গোছা হাতে উর্দুভাষী চললো আমাদের ঘর দেখাতে। প্রথমে দেখালো ছোট্ট একটা বদ চেহারার ঘর, বাথরুম থেকে টুকরো সমুদ্র চোখে পড়লো। এ-রকম ঘরে একটা ঘণ্টাও কাটাতে হবে ভাবতে কান্না পেলো। এর কিরায়া এক টাকা। আর ঘর নেই? বড়ো ঘর? আছে, আড়াই টাকা কিরায়া। বেশ, লে চলো। দোতলামে কামরা নেই হ্যায়? নেই। একতলাতেই নিয়ে গেলো বেশ বড়ো একটা ঘরে, সঙ্গে খাবার ঘর, সামনে বারান্দা, আর বারান্দার পরেই সমুদ্র। কিন্তু গোপালপুরের মতো চোখ-জুড়োনো শ্রম-তাড়ানো সমুদ্র নয়—সমুদ্র দেখেও কোনো শান্তি হ'লো না এখানে—মেঘলা আকাশের তলায় ফুলে-ফুলে দুলে উঠছে ঘোর ব্রাউন রং-এর দুর্দান্ত জলরাশি, এক-একটা ঢেউ যেন হাঙরের হাঁয়ের মতো তাড়া ক'রে ছুটে আসছে, বাড়িঘরসুদ্ধু গিলে খাবে।

সেই ঘরেই আশ্রয় নেয়া গেলো। ঝটকাওলাদের এক টাকা ক'রে দিলুম, তা ছাড়া খুচরো বকশিষ। সাধারণ রেট আট আনা। একটা আয়া ঠিক করা হ'লো 'বাচ্চাকো পাকড়ানেকোওয়াস্তে', উর্দু-বলনেওলা দরোয়ানই দিলে ঠিক ক'রে। আয়াটি হিন্দি বলতে পারে, ইংরেজিও জানে একটু-একটু, অতিশয় মার্জিত মসৃণ হাবভাব, পরনের শাড়িটি

সুন্দর, পরেছেও সুন্দর ক'রে। নাম সরমা। নেবে চার আনা ক'রে রোজ। সম্প্রতি আমাদের ভাগ্যে যা-কিছু ঘটেছে তার মধ্যে এই সরমাই যা একটু ভালো লাগবার মতো। পরে দেখা গেলো, কাজেকর্মেও সে খুব নিপুণ, মুখেও কথাটি নেই। মহা খুশি মক্ষিরানি।

এটা পরের কথা। ঠিক সেই মুহূর্তে খুশি হবার মতো এক ফোঁটাও কারণ নেই আমাদের সামনে। চারদিকে ছড়ানো জিনিশপত্রের মধ্যে হতাশভাবে খাটের উপর ব'সে আছি, পাগলা ঝোড়ো সমুদ্রটার দিকে তাকিয়ে মন আরো খারাপই হ'য়ে যাচ্ছে। এসেই খবর পেয়েছি, এখানে খানাপিনা মেলে না। তারপরে এই ঘরে আসবার পথে আমাদের সেই মুসলমান ডেপুটি-সাহেবের সঙ্গে দেখা। কী খবর? তাঁদের পুরো দলটি গোপালপুর থেকে পুরী যাচ্ছিলেন, গাড়ি ফেল ক'রে উল্টো পথে চ'লে এসেছেন ওয়াল্ট্যায়ার। কিন্তু আজ দুপুরেই তাঁরা চ'লে যাচ্ছেন। আজই? আরে ছী-ছি, বলবেন না, এখানে মানুষে থাকে! যা ওয়েদার দেখছেন তো। আর তাছাড়া, না-খেয়েই মারা যাবো যে। প্রথম দিন এক হোটেল থেকে খাবার আনিয়েছিলুম, কার সাধ্য সেই মান্দ্রাজি রান্না মুখে তোলে। কাল থেকে আমরা আছি রুটি-মাখন আর টিনের মাছ-মাংসের উপর ভরসা ক'রে, তাও খাবার জিনিশ অসম্ভব চুরি হয় এখানে। মাংসের টিন খোলাও হয়নি, কে এসে খুলে খেয়ে গেছে। রুটিগুলো তো চোখেই দেখি না। কী হয়? আর-কিছু না, ঐ দরোয়ানের ছেলেটা নিয়ে যায়। তারপর জানেন, দোতলায় এক মৌলবি সাহেব আছেন, তাঁকে কাল রাত্রে ভূতে ধরেছিলো। ভূত!

বললেন কী? আরে হ্যাঁ, উপরে মিঃ ব্যানার্জিরা আছেন, জিগেস ক'রে দেখবেন। আর জানেন, এই রাস্তাটা ভারি বদ, কাল সন্ধের একটু পরেই আমাকে গুণ্ডায় ধরেছিলো। আমি অবিশ্যি ঘুষি লাগিয়ে চ'লে এলুম, কিন্তু রাস্তাটা মোটে ভালো না, সাবধান। তাছাড়া, ডেপুটি-সাহেব গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, এ-বাড়িতে ঢের টি-বি পেশেন্ট থেকে গেছে, এখনো একজন আছে, ঐ ওদিকের ঘরে, সমস্ত দিন দরজা বন্ধ ক'রে থাকে, কক্ষনো বেরোয় না, নির্ঘাত যক্ষ্মারোগী মশাই, কোনো ভুল নেই। এতগুলোর মধ্যে একটাকেও ঠিক সুখবর ব'লে গণ্য করা যায় না; বিশেষত, সারা রাত গাড়িতে জেগে ব'সে বৃষ্টিতে ভিজে পৌঁছবার পর শরীর-মনকে সতেজ ক'রে তোলবার মতো কোনোটাই নয়।

কিন্তু হতাশভাবে ব'সে থাকলে হতাশা শুধু বেড়েই চলে, তাই উঠে গেলুম দোতলায়। গোপালপুরের ডাকবাংলোয় যে-ভদ্রলোকদের সঙ্গে কলিশন হয়েছিলো, তাঁরাই হচ্ছেন ব্যানার্জিরা। পরে গোপালপুরেও তাঁদের সঙ্গে দু একবার দেখা হয়েছে। দুই ভাই, দু-জনেই উঁচুদরের রাজপুরুষ, বড়ো ভাই তো সাক্ষাৎ পুলিশ-সাহেব। সঙ্গে আছেন তাঁদের প্রোফেসর ভাগ্নে, এবং আরো এক ভদ্রলোক, ধরা যাক তাঁর নাম মিঃ নন্দী। এখানে এই ভদ্রলোকের কথা একটু ব'লে নিই। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'তে তিনি আমাকে প্রথম যে-কথা জিগেস করলেন, তা এই: 'আপনি কোন বছর বিলেত থেকে এসেছেন?' এতে আমি যত না অবাক হলাম তিনি বোধহয় তার চেয়েও অবাক হলেন এ-কথা শুনে যে আমি মোটে

বিলেতে যাই-ই নি। পরমুহূর্তেই আমি অবশ্য জানতে পারলুম যে তিনি বহুকাল ইওরোপে আমেরিকায় কাটিয়ে এসেছেন। অতিশয় সদালাপী অমায়িক ভদ্রলোক: তাঁর কথাপ্রসঙ্গে কেবলই জানতে লাগলুম কোন-কোন বড়োমানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা।

যা-ই হোক, উপরে গিয়ে দেখি ব্যানার্জি-দল তখনো লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে। তাঁদের ওখানে এক ব্যারিস্টর সাহেব উপস্থিত, তিনি দোতলায় একটা স্যুইট নিয়ে সপ্তাহ তিনেক থ'রে আছেন। প্রাথমিক সম্ভাষণাদি অবস্থা বুঝে সংক্ষিপ্ত হ'লো, তারপর ভূতের গল্প শুনলুম। পাশের ঘরে মৌলবি সাহেব কাল রাত্রে স্পষ্ট দেখলেন এক জেনানা আদমি তাঁর শিয়রে একটা গেলাশ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে বলছে—শরাব পিয়। ধর্মভীরু মৌলবি সাহেব কিছুতেই খাবেন না, সে-ও জোর ক'রে খাওয়াবেই। তারপর সেই ভৌতিক স্ত্রী-মূর্তি চ'ড়ে চেপে বসলো তাঁর বুকের উপর—প্রাণ যায় আরকি। চীৎকার করতে-করতে বেরিয়ে এলেন মৌলবি সাহেব, ব্যানার্জিরা ছুটে এলেন, তন্ন-তন্ন তল্লাশ ক'রেও কোথাও কিছু দেখা গেলো না। মৌলবি সাহেব তো বাকি সমস্তটা রাত আলো জ্বেলে ব'সে কোর্‌আন প'ড়ে কাটিয়ে দিলেন—'আমাদেরও সারারাত আর এক ফোঁটা ঘুম হয়নি, মশাই, এই তো উঠেছি। ভাগ্নেটির তো নর্ভাস ব্রেকডাউন হবার যোগাড়, আজই সে চ'লে যাচ্ছে কলকাতায়।'

সম্প্রতি নিজেদের অতি বাস্তব শারীরিক অস্তিত্ব নিয়েই এত বেশি ব্যাপৃত আছি যে অপরের অশরীরী আবির্ভাবের কথা বেশিক্ষণ চিন্তা করতে পারলুম না। দু-পেয়ালা চা পাঠিয়ে

দেবার অনুরোধ জানিয়ে ফিরলুম নিজের ঘরে। ব্যানার্জিরা ঠাকুর-চাকর পাইক-পেয়াদা নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন, স্থানীয় একটি কনেস্টবলও তাঁদের দরজায় হাজির। সঙ্গে দুটো আনকোরা নয়া ইকমিক-কুকার, একটি স্টোভ, সুপ্রচুর রশদ। পরে দেখা গেলো, ইকমিক-কুকার তাঁরা দু-দুটো কিনে এনেছেন বটে, কিন্তু ব্যবহারটা জেনে আসেননি, স্টোভটাও ভালো অবস্থায় নেই, সুতরাং বিস্তর জনবল এবং যন্ত্রবল সত্ত্বেও রন্ধনে আহারে তাঁদের কিছুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না। মাত্র স্পিরিট-ল্যাম্প সম্বল ক'রে আমরাই ভালো ছিলুম বরং।

একটু পরেই তাঁরা চা বিস্কুট পাঠিয়ে দিলেন। গোপালপুর থেকে দুটো সেদ্ধ ডিম এনেছিলুম, চায়ের সঙ্গে খাবো মনে ক'রে খুলতে গিয়ে দেখি, নেই। এ-ঘরে এসেও যে দেখলুম, এরই মধ্যে উধাও হ'লো! হাতে-হাতে প্রমাণ পেয়ে গেলুম ডেপুটি-সাহেবের কথার। মক্ষিরানির মতে ডিম সঙ্গে ক'রে কক্ষনো বেরোতে নেই, ওটা নাকি অযাত্রা, দুর্ঘটনা ঘটবেই। দুর্ঘটনার ধারাবাহিক নভেল তো চলেইছে, শেষ পর্যন্ত ডিম দুটো ভক্ষণ করতে পারলে তবু কিছু প্রতিশোধ নেয়া যেতো। আমার আপশোষ সেইখানে।

এতগুলো বন্ধুস্থানীয় মানুষের মুখ দেখে এতক্ষণে আমাদের প্রাণে একটু ভরসা হয়েছে। ইতিমধ্যে সরমা বেশ ফিটফাট ক'রে ঘর গুছিয়ে ফেলেছে, বাইরে রোদ থাকলে ভালোই লাগতো এতক্ষণে। কিন্তু বৃষ্টির বিরাম নেই, তার উপর রান্না-খাওয়ার চিন্তা, কিছুতেই কোনো ভালো লাগার ভাব মনে আনতে পারছি না। হিংস্র সমুদ্রের বুকে

একটা জাহাজ ছবির মতো দাঁড়িয়ে; আর সমুদ্রের মধ্যে যে-পাহাড়টা বিরাট জলজন্তুর মতো মুখ থুবড়ে পড়েছে, তার গায়ে লেগে গুমগুম শব্দে প্রচণ্ড লাফ দিয়ে উঠছে ঢেউগুলো। পাশেই ব্রেকওয়াটার, আস্ত দুটো জাহাজ পাথরে ভর্তি ক'রে জলের মধ্যে ডুবিয়ে ওখানে সমুদ্রকে বাঁধা হয়েছে, তারই ধার দিয়ে-গিয়ে কাটা খাল বেয়ে জাহাজগুলো শহরের বন্দরে পৌঁছয়। খালের জলে তারা নিজেরা অচল, তাদের টেনে নিয়ে যাবার জন্য আলাদা জাহাজ আছে, দেখতে ছোটো, কিন্তু খুব জোরালো। তামাটে রঙের ঝোড়ো আকাশের নিচে এই সমুদ্রের চেহারা কেমন ভয়ানক লাগছে, পিঠ-উঁচোনো পাহাড়ে আর রুক্ষ কঠিন ব্রেকওয়াটারে মিলে আরো যেন দুষমনের মতো দেখতে হয়েছে। ওদিকে তাকিয়ে কোনো সান্ত্বনাই পেলুম না।

কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেলুম, যখন ব্যানার্জিদের ছোটো ভাই শ—বাবু ফ্লাস্কে ক'রে গরম কফি নিয়ে এলেন। দিলখোলা মিশুক মানুষ, আলাপ ক'রে ভালো লাগলো। ফিরোজ ম্যানশন্স-এর বিবিধ দুঃখকষ্ট এই দুই ভাইয়ের সান্নিধ্যে ও সাহায্যে অনেকটাই লাঘব হয়েছিলো আমাদের। তাঁরা প্রকৃত ভদ্রলোক: এর বেশি কিছু বলা বাহুল্য।

নিতান্ত মন-মরাভাবে খাওয়া সারলুম। এ-মেঘ যে কখনো কাটবে মনে হয় না। এক্ষুনি কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবি, কিন্তু এই বৃষ্টিতেই আবার বেরোতে হবে, এ-কথা ভেবে তাতেও উৎসাহ পাই না। বন্যার জলের উপর আশার ঘুঘু দেখা গেলো দুপুরবেলায়। শ—বাবু এসে বললেন, উপরে একটা স্যুইট খালি আছে, সেখানে আসুন আপনারা।

তাহ'লে এত খারাপ লাগবে না। লাফিয়ে উঠলুম। দরোয়ান যে বললে খালি নেই? জবাবদিহি দিলে দরোয়ান—উপরের কামরা তিনটাকা কিরায়া! বেশি কিছু বলতে চাই না, তবে ঐ দাড়িওলা বুড়ো এবং তার পুত্র উভয়েই যে ঘোরতর বদ সে-বিষয়ে ঐ অল্প সময়েই নিঃসন্দেহ হ'তে পেরেছিলুম। এ-কথা এখানে লিখতে পেরে আমি খুবই খুশি হচ্ছি যে ওদের দু-জনেরই ওখান থেকে চাকরি গেলো দু-দিন পরেই, যদি-না ওখানকার পার্শি এজেন্টের কথায় অবিশ্বাস করতে হয়।

তখনই বদলি হলুম দোতলায়। ব্যানার্জিদের আর ব্যারিস্টর সাহেবের মাঝখানে আমরা। ব্যবস্থা সব একই রকম, কিন্তু দোতলায় এসেই ঢের ভালো লাগলো। এ-ঘরে অনেক বেশি আলো; দিগন্ত-ছোঁয়া সুদূর সমুদ্রের ধূ-ধূ ছবি অনেক স্পষ্ট হ'য়ে চোখে পড়ে। কাছাকাছি যাঁরা রয়েছেন, উৎসাহের আংশিক কারণ তাঁরাও বটে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম যেন। গুছোনো হ'লো ঘর, তারপর এতক্ষণে একটু বিশ্রাম। বাদলার বেলা ঝেঁকে-ঝেঁকে চলেছে, কখনো দেখা যাচ্ছে পাংশু আলো, আবার মেঘ আসছে ঘন হ'য়ে; নামছে বৃষ্টির পশলা, বাজছে শোঁ-শোঁ হাওয়া, রাগি ব্রাউনরঙের সমুদ্রে চলেছে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভীষণ তোলপাড়। এমনি ক'রে বিকেল হ'লো, চা খেলাম; এমনি ক'রে সন্ধে হ'লো। ততক্ষণে আমাদের ভালো লাগতেই শুরু করেছে। হারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেলো ঘরে, এখানে সন্ধ্যা মানেই যেন ঘুমের আহ্বান। লেপের নিচে পা ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটু শুয়েছি, এমন সময় হঠাৎ দেখা গেলো মক্ষিরানির গায়ের কোটটি নেই।

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলুম দু-জনে, খোঁজ খোঁজ, আলমারি দেরাজ ঘেঁটে বিছানা উল্টিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক কাণ্ড। নেই তো নেই। আয়াকে জিগেস করলুম, সে কিছুই জানে না। খাবার ঘরটা দেখলুম, একতলায় যে-ঘরে ছিলুম সেটা খুঁজে এলুম টর্চ জ্বেলে-জ্বেলে। গেছে। চুপসে দ'মে গেলো মনটা। আজকের দিনের সমস্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দুর্ভাগ্য এতক্ষণে চরমে এসে ঠেকলো। উপরে এসে ব্যানার্জিদের খবরটা দিলুম। তক্ষুনি তাঁরা আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত। রা—বাবু (যিনি পুলিশের কর্তা) বললেন, 'ওরাই কেউ সরিয়েছে, এক্ষুনি দিচ্ছি বার ক'রে।' তারপর তিনি রাজশক্তির প্রতিনিধিরূপে যথোচিত কর্তব্য আরম্ভ করলেন। কী-রকম কোট? কালো রঙের ফার-এর। পথে ফেলে আসেননি তো? না, আমার স্পষ্ট মনে আছে আমিই হাতে ক'রে এনেছিলাম। উপরে এনেছিলেন? মনে পড়ছে না। ডাকা হ'লো সেই বুড়ো দাড়িওলাকে আর তার ছেলেকে; রা—বাবুর প্রচণ্ড দাবরাবে আমি সুদ্ধু স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। এক্ষুনি কোট পাওয়া চাই, নয়তো মান্দ্রাজের সমস্ত পুলিশ দিয়ে এই বাড়ি ঘেরাও করাবেন তিনি। দু-ভাই মিলে আয়াটাকে ঝাঝরা ক'রে দিলেন অনর্গল প্রবল হিন্দিতে; আর মেয়েটা হাতের ভঙ্গি ক'রে ঈশ্বরের ও স্বীয় পুত্রের নামে শপথ ক'রে এমন মিহি গলায় প্রতিবাদ করতে লাগলো যে দেখে-দেখে আমার মনে হ'তে লাগলো নাটক দেখছি। রা—বাবু বললেন, আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, তারপরেই পুলিশ ডাকবো। যাও, খোঁজো তোমরা। ব্যাপারখানা যতদূর সম্ভব চ'ড়ে উঠেছে, এমন সময় দাড়িওলাটা লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতে গেলো। একটু পরেই

একতলা থেকে শোনা গেলো চীৎকার—আইয়ে সাব, মিল্ গিয়া, আইয়ে। রা –বাবু নিচে গেলেন, উঠে এলেন বিজয়ী বীরের মতো কালো ফার-এর কোটটি হাতে ক'রে। কোথায় পাওয়া গেলো? একতলায় যে-বিশ্রী ছোটো ঘরটা প্রথমে আমাদের দেখানো হয়েছিলো, সেই ঘরে। আমরাই কি তবে ভুল ক'রে ফেলে এসেছিলুম?

কিন্তু আমাদের বিবেকপীড়িত হবার কোনো কারণ নেই। এটা ঠিকই যে ও-ঘরে ফেলে আমরা আসিনি। এটা নিশ্চিত বোঝা গেছে যে ঐ দাড়িওলা আর তার ছেলেটা মিলেই চুরি করেছিলো কোট, বেগতিক বুঝে দিয়েছে বার ক'রে। আমরা যে দু-মিনিটের জন্য ঐ ঘরটায় দাঁড়িয়েছিলুম তার সুযোগ নেবার মতো দুর্বুদ্ধির ওদের অভাব হয়নি। অর্ধেক গিলেও উগরে ফেলতে হ'লো খোদ পুলিশসিংহেরই হুংকারে; আমাদের স্বকীয় চেষ্টায় যে ঐ কোট উদ্ধার করা অসম্ভব ছিলো সে-কথা অবশ্য না-বললেও চলে।

রা বাবুকে যথাসাধ্য ধন্যবাদ জানালুম। তিনি বললেন, বেশ তো, একটু হৈ-হৈ করা গেলো। মাঝে-মাঝে এ-রকম কিছু না-হ'লে একঘেয়ে লাগে। আমি মনে-মনে বললাম, তাহ'লে আমার জীবন নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়ে হোক। রা—বাবু বললেন, 'এ যে ওদেরই কাণ্ড তা আমি প্রথম থেকেই বুঝেছি, আয়াকে যে ধমকাচ্ছিলুম সে ওদেরই শুনিয়ে; বুঝে নিয়েছে সহজ লোকের পাল্লায় পড়েনি, আপনারা এর পর নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' নিশ্চিন্ত ভাবটাই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা; এ-ঘটনায় সেটায় যে চিড় ধরলো সবচেয়ে বিশ্রী লাগলো তাতেই। আমরা মানুষকে বিশ্বাস ক'রে অভ্যস্ত;

তারই জোরে স্বাধীনভাবে চলি ফিরি, ভোগ করি আধুনিকতার সুখ-সুবিধা। সেই বিশ্বাসের স্থান যেখানে নেই, সেখানে আমাদের টেঁকাই মুশকিল। সব সময় যদি ঘোরতর সতর্ক হ'য়ে থাকতে হয়, প্রত্যেকের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাতে হয়, এক মুহূর্ত যদি ঘর খালি রেখে বেরোবার উপায় না থাকে—এক কথায়, যদি টাকাকড়ি জিনিশপত্রের পাহারায় কয়েদি হ'য়েই দিন কাটাতে হয়, তাহ'লে --তাহ'লে আর বেঁচে সুখ কী, আমি তো তা ভেবে পাইনে। তবে ওয়াল্ট্যায়ারে আর যে-ক'দিন আছি, এই ভাবেই কাটাতে হবে সেটা তখনই মনে-মনে ঠিক ক'রে ফেললুম। পরস্পরকে যে আমরা বিশ্বাস কবি সেটাই সভ্যতা; কিন্তু এখনো বোধহয় এমন অনেক জায়গাই আছে যেখানে সভ্যতার রীতিনীতি অচল।

কোটেব উত্তেজনাব নিবৃত্তি হয়েছে; আয়া শান্ত মুখে কাজে লেগেছে আবার; স্পিবিট-ল্যাম্পে চড়েছে রাতের রান্না। লণ্ঠনে অত বড়ো ঘর কিছুই আলো হয় না; বাইরে, সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ বুকের দীর্ঘশ্বাসটাই যেন হা-হা শব্দে বাতাস হ'য়ে স্বনিত হচ্ছে। শোবার আগে প্রত্যেকটি দবজা খুব ভালো ক'রে দেখে নিলুম, শিয়রে বইলো টর্চ। দীঘ একটা দিন শেষ হ'লো; এবং এ-কথা লিখতে পেরে খুশি হচ্ছি যে সমস্ত দুর্ভোগের পরে রাত্রে ঘুম হ'লো চমৎকার। চোরও এলো না, ভূতও এলো না; আব যক্ষ্মারোগের বীজাণু সম্বন্ধে যদি-বা মনে কোনো দুশ্চিন্তা ছিলো সেটা একেবারেই চাপা পড়লো ঘন ঘুমের তলায়।

ফিরোজ ম্যানশন্স

পরদিন সকালে উঠেই ঐ দাড়িওলার সঙ্গে এক বিতিকিচ্ছিরি বচসা হ'য়ে গেলো। লোকটা অতিশয় ইতর; এ-সব লোক দিয়ে পৃথিবীতে আর-কিছুই হয় না, খামকা খানিকটা মেজাজ খারাপ আর সময় নষ্ট নয়। কিন্তু মেজাজ খারাপ করবার মতো দিন নয় আজ। ছ্যাখো, ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে ঝিকিমিকি রোদ উঠেছে সমুদ্রের উপর। সেই রোদের রেখাই পরিষ্কার ভাগ ক'রে দিয়েছে সমুদ্রকে; যে-অর্ধেক আমাদের সামনে, তাতে লেগেছে গাঢ় গেরুয়া রং, প্রায় লাল; লাল হ'য়ে মস্ত-মস্ত ঢেউগুলো গড়িয়ে-গড়িয়ে আসছে আর ভাঙছে;—মনে হয় কালকের ঝড়ে তলাকার সব বালু উঠেছে ঘুলিয়ে। আর সমুদ্রের দূরের অর্ধেক নির্মল উজ্জ্বল নীল, শাদা ফেনা-ছিটোনো। এখানকার সমুদ্রের দেখছি সব সময়ই একটা অস্থির দুর্দান্ত ভাব; যেন খেপেই আছে। এর সঙ্গে পুরীর সমুদ্রের তুলনা হয় না, গোপালপুরের তো নয়ই। এ-সমুদ্র দাঁত-দেখানো, ভয়-দেখানো; এ নয় বতিচেলির শঙ্খ-চিকন সমুদ্র, নয় জলকন্যাদের প্রবাল-প্রাসাদের স্বচ্ছ-নীলাভ ছাদ, শাদা ফেনায় গম্বুজের পর গম্বুজ-তোলা; এ সমুদ্র নয় স্বপ্নের, নয় শান্তির, নয় ক্লান্ত চোখে স্নেহস্পর্শময়। বরং একে মনে হয় নিষ্ঠুর, মনে হয় ক্ষুধিত ও আহত, তিমির তপ্ত রক্তের তাড়া-খাওয়া, হাঙরের ধারালো দাঁতে ছিঁড়ে-যাওয়া, মনে হয় একটা উতরোল অন্ধ আতঙ্ক, যাতে ঝড় ওঠে, যাতে জাহাজ ডোবে, যাতে হাজার মানুষের জীবন বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়। এখানকার সমুদ্র শুধু জীবন্ত নয়, জান্তব; এই জলরাশির তলে যে-তীব্র প্রাণস্রোত

অন্ধ হত্যার প্রেরণায় উৎসারিত, এর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে তারই যেন দুরন্ত দস্যুতা।

আসলে ফিরোজ ম্যানশন্স বাড়িটি কিন্তু মন্দ নয়। অবস্থান হিশেবে এত ভালো বাড়ি ওয়াল্ট্যায়ারে আর নেই-ই, সত্যি বলতে। গোপালপুরের মতো এখানেও আমরা প্রথম দিন খিড়কি দিয়ে ঢুকেছিলুম, তাই অত বিশ্রী আর নোংরা লেগেছিলো। যেদিকে মুখ ক'রে বাড়িটি দাঁড়িয়ে, সেদিকে তিন-চার মাইল লম্বা একটি রাস্তা সোজা চ'লে গেছে, বরাবর সমুদ্রের ধার দিয়ে, হেঁটে কি গাড়িতে বেড়াবার পক্ষে চমৎকার। রাস্তার ওপারে একসার গাছ এখনো বড়ো হবার অপেক্ষা করছে, গাছের বেড়ার পরেই সমুদ্রসৈকত। কাছেই বিখ্যাত ডলফিন্স নোজ, সমুদ্রের উপর মুখ-থুবড়ে-পড়া পাহাড়। বাড়িটার পিছনের দিকে তাকালেও আঁকাবাঁকা উঁচু পাহাড় চোখে পড়ে, তাও সুন্দর। একটু চেষ্টা করলেই এই ফিরোজ ম্যানশন্সকে একটি পয়লা-নম্বরি পান্থশালা ক'রে তোলা যায়, কিন্তু ওর ভিতরকার অবস্থা যে ভালো নয় তা আমার এই বর্ণনা থেকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে। ইলেকট্রিসিটি নেই; বাথরুমের ব্যবস্থা দেখলে কান্না পায়। এখানে সমুদ্রে স্নান করা যায় না; আস্ত-আস্ত রাজামার্কা চাকতির বদলে বাথরুমে যেটুকু জল দেয় তা আমাদের হাত-মুখ ধোবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। ওয়াল্ট্যায়ারে তিন দিন ছিলুম, আমি তার মধ্যে একবারও স্নান করতে পাইনি। খাওয়া হয়েছে অনিয়মিত এবং প্রায়ই দায়-সারা গোছের, শরীরের কষ্টও গেছে আমাদের পক্ষে অসামান্য, তবু আমাদের একটু মাথা ধরেনি কি অসুস্থ লাগেনি, কখনো মনে হয়নি

ক্লান্ত। কেবলই মনে হয়েছে আরো পারি। আর সবসুদ্ধু ঝাপট যতটা গেছে তার একটি ভগ্নাংশও কলকাতায় ঘটলে আধমরা হ'য়ে যেতুম। বেড়াতে এসে আমাদের মনের সুর বদলে যায়, তা সত্যি, বাড়ির আরাম আর আশাই করি না ব'লে অনেকখানি অসুবিধেও আমরা মেনে নিই—কিন্তু তারও একটা সীমা নিশ্চয়ই আছে, যে-সীমা এই ওয়াল্ট্যায়ারে প্রায় আমরা পেরিয়েছিলুম। এ থেকে এটুকু অন্তত প্রমাণ হ'লো যে ওয়াল্ট্যায়ার সত্যিকার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

কিন্তু এই স্বাস্থ্যকরতা যে ভালো ক'রে ভোগ করবো তা আমাদের ভাগ্যে ছিলো না। মোটে শান্তি ছিলো না মনে। সেই যে যক্ষ্মারোগীর কথা কানে এসেছে, তারপর আর দেয়াল স্পর্শ করি না, মেঝেতে কোনো জিনিশ ছোঁয়াই না পারতপক্ষে, বাথরুমে ঢুকতেই কেমন গা-ঘিনঘিন করে, মনের খুঁতখুঁতানি লেগেই আছে সারাক্ষণ। এতখানি অস্পৃশ্যতা মেনে নিয়ে বসবাস বড়ো সহজ কথা নয়। এত না-ভাবলেও হয়, কিছু না-ভাবাই ভালো, কিন্তু এই 'বৈজ্ঞানিক' যুগে না-ভাবার মতো সাহসও নেই মনে। এই বাড়িটার মধ্যে কোনো রকমেরই সুখ হ'লো না আমাদের। সুন্দর এই পাহাড়ে ঘেরা সমুদ্রে ধোয়া দেশ, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টদোষে তাকে পুরোপুরি মূল্য দিতে পেরেছিলুম শুধু ফেরার দিনে কলকাতার ট্রেনে নিশ্চিন্তে ব'সে।

আপাতত রোদ উঠেছে ঝিকিরমিকির, চলো বেড়াতে। একটা ঝটকা ঠিক হয়েছে, পাঁচ সিকেয় আমাদের শহর ঘুরিয়ে আনবে। দরজায় লাগালুম এক ধার-করা প্রকাণ্ড তালা, আয়াকে সঙ্গে নিলুম একাধারে গাইড এবং মানবিকার

বাহনরূপে, রশদ নিলুম কমলালেবু আর চকোলেট। আজ কিন্তু ঝটকাতে মন্দ লাগছে না। নতুন জায়গা দেখার পক্ষে মোটরগাড়িটা আমার পছন্দ হয় না; বড্ড ব্যস্তবাগিশের মতো হুশহুশ ক'রে চ'লে যায়, আশে-পাশে চোখ বুলোনো হয় শুধু, তার বেশি সময় হয় না। ঝটকার অসুবিধে শুধু এই যে পিছন দিকে বসতে হয়; যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে তাকাতে না-পারলে চোখের দেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবু মন্দ না। আজ সমুদ্র থেকে একটি চমৎকার শুকনো হাওয়া দিচ্ছে; এ-হাওয়ায় স্বাস্থ্য, এতে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় এমন খিদে পেতে থাকে যে রীতিমতো অসুবিধেই লাগে এক-এক সময়। শুশুক-নাসিকার পাশ দিয়ে রাস্তা বেঁকে গেছে; সমুদ্র আমাদের চোখ থেকে হারিয়ে গেলো। একটা মস্ত পাহাড় ঘুরে, কাটা খালের ধার দিয়ে এঁকে-বেঁকে, নানারকম ইস্পাতের ইমারত আর রেলের লাইন পার হ'য়ে জাহাজ-ঘাটে এসে পৌঁছলুম। আপিশের অনুমতি নিয়ে ঢুকলুম ভিতরে; এখন কোনো জাহাজ নেই, তিনটের সময় আসবে। গুণ্ডা চেহারার বাচ্চা জাহাজ দেখলুম, বুড়ো জাহাজগুলোকে টেনে আনা ওদের কাজ। লোহার এক-একটা দৈত্য উঠেছে আকাশে, তার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করছে চাটগেঁয়ে খালাশি। এখানে-ওখানে দু-চারজন লোক ছড়িয়ে আছে, খালের ঘোলা জল নিস্তরঙ্গ, দূরে পাহাড়ের ঝাপসা নীল ছবি। জায়গাটা আধো-ঘুমন্ত গোছের, হার্বর বলতে মনে যে একটা ঝমঝমে ভাবের উদ্রেক হয়, সে-রকম কিছুই নয়। বোধহয় জাহাজ এলে জেগে উঠবে।

হার্বর থেকে বেরিয়ে চললুম শহরের দিকে। রোদ উঠেছে, বেশ গরম। ভারি সুন্দর একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। শহরটি উঁচু-নিচু, দূর থেকে গাছের সবুজে ঘেরা ধাপে-ধাপে-ওঠা বাড়িগুলো ছবির মতো দেখতে লাগে। যেদিকে তাকাও, পাহাড় চোখে পড়বেই। ঝটকাওলাকে বললুম, বাজারের দিকে চলো। স্পিরিট ইত্যাদি চাই, মক্ষিরানির একখানা শাড়িরও ইচ্ছে। দক্ষিণী শাড়ির বৈশিষ্ট্য আছে, সবাই জানেন ; এখানে এসে পথে-ঘাটে যে-সব মেয়ে দেখেছি, তাদের পরনের শাড়িও বেশ চোখে পড়ার মতো। অথচ ও-সব শাড়ি আটপৌরে গোছের, নেহাৎ সাধারণ, দাম হয়তো অল্পই হবে ; কিন্তু যত সব মিলের শাড়ি বাঙালি মেয়েদের অঙ্গে নিত্য উঠছে তাদের মধ্যে দামের, নামের চটক আছে ঢের, কিন্তু অতখানি সুশ্রী একখানাও নেই। আমাদের আয়া একটি শাড়ি পরে ; কিছুই নয়, কিন্তু ছাপানো রঙিন পাড়টি ফুটফুট করছে। এ-সব এখানকার হাতে তৈরি ঘরোয়া জিনিশ, জনসাধারণের জন্য ; কিন্তু অ-সাধারণ হ'য়ে আমরা যে ঠ'কে গেলুম এ-রকম একটা সন্দেহ থেকেই গেলো আমাদের মনে। লজ্জার মাথা খেয়ে আয়াকে জিগেস করা গেলো না তার পরনের শাড়িটির মতো আর-একটি কোথায় গেলে পাওয়া যাবে। 'মেমসায়েব'কে যেতেই হবে বড়ো দোকানে, চড়া দামের বাজারে।

এই তো বাজার। নাম বুঝি এডওঅর্ড মার্কেট, কিন্তু ব্যাপার তেমন কিছু নয়। এক মনোহারি দোকানে ঢুকে জিগেস করলুম : 'মেথিলেটেড স্পিরিট আছে?' দোকানি প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকালো। এই একটা বিষয়ে অভ্যেস

হওয়া শক্ত, প্রথমে মনে হ'লো নেই বুঝি। কিন্তু পরমুহূর্তেই বেরোলো স্পিরিটের বোতল। পৃথিবীর সর্বত্রই 'হাঁ' বলতে লোকে উপরে-নিচে মাথা নাড়ে, আর 'না' বলতে পাশাপাশি। একমাত্র ব্যতিক্রম এই মদ্রদেশ। যখন বলবে 'হাঁ', মাথাটাকে কোণাকুণি পাঁচ-ছ-বার এত জোরে নাড়াবে যে মনে হবে ঘোরতরভাবে অস্বীকার করছে। আমাদের আয়াও তা-ই করে, ঝটকাওলারাও তা-ই, এ-পর্যন্ত স্থানীয় লোক যত দেখেছি সকলেই তা-ই করে। সমস্ত মনুষ্যজাতি থেকে এই একটা বিষয়ে দ্রাবিড়জাতীয়রা কী ক'রে আলাদা হ'লো, নৃতত্ত্বের পণ্ডিত এ নিয়ে চিন্তা করবেন। আমার সময় নেই, বেলা বাড়ছে।

স্পিরিট নিয়ে বেরিয়ে কতগুলো কাপড়ের দোকান দেখা গেলো পাশাপাশি। ছোটো-ছোটো দোকান, চেহারা দেখে বিশেষ ভরসা হয় না, কিন্তু আয়া বললে যে এ-ই হচ্ছে সব-সেরা। মান্দ্রাজি ভদ্র মেয়েরা যে অতি উজ্জ্বল দ্বিবর্ণ শাড়ি পরেন, সেইরকম একখানা চান মক্ষিরানি। কপালগুণে ঠিক ঐ জিনিশই অনেকগুলো দেখা গেলো। টকটকে লালে-সবুজে একখানা তেরো হাত লম্বা পট্টবস্ত্র খুব পছন্দ হ'লো। জিগেস করলুম 'কত দাম?' কণ্ঠস্বরে নিশ্চয়ই কোনো দ্বিধা ছিলো না, কিন্তু প্রাণে ভয় ছিলো। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আবার সহজ হ'লো, যখন জবাব শুনলুম, 'থ্রি রুপি।' ঝপাশ ক'রে বেরোলো তিন মুদ্রা, ঐ লাল-সবুজ শাড়ি আমাদের। মহা খুশি মক্ষিরানি। চুপি-চুপি বলতে লাগলো: 'কী শস্তা, কী শস্তা। তা কত আর দাম হবে, পাটের শাড়ি তো। কিন্তু হ'লোই বা পাটের, কী সুন্দর! দাম দিয়ে কী হবে, সুন্দর হ'লেই হ'লো।'

বাড়ি ফিরতে বেলা হ'লো। ব্যানার্জিরা একরাশ সমুদ্র-মৎস্য কিনেছিলেন, নুটিশ দিয়ে রেখেছিলেন আগেই, মিসেস বোসকে রাঁধতে হবে, খাওয়া হবে একসঙ্গে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে স্তিমিত স্টোভ নিয়ে লেগে গেলেন মিসেস বোস। মাছ তো নয়, মাছের বাজার। এদিকে শ্রীযুক্ত স্টোভ অবিশ্রান্ত পম্প না-ঠেললে জ্বলবেন না, আর বাসন-কোশনের যা অসুবিধে তা তো আছেই। এমনি ক'রে অর্ধেক প্রায় হয়েছে, এমন সময় ব্যারিস্টর সাহেবের তোলা উনুন এসে উদ্ধার করলো। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমার কিছুই করবার নেই, আমি নবাবের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, সিগারেট ফুঁকছি, ব'সে-ব'সে সমুদ্র দেখছি। খাবার ডাক এলে খেতে যাবো। হায় পুরুষ !

সিমাচলম

ব্যানার্জিদের ঘরে ব'সে ভোজ হ'লো চমৎকার। বেলা তখন তিনটে। আর সময় নেই, এক্ষুনি আবাব বেরোতে হবে। ব্যানার্জিদের সঙ্গে যাচ্ছি সিমাচলম—কি সিংহাচলম--পাহাড় দেখতে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। পাহাড়টি দশ মাইল দূরে, চূড়ায় আছে মন্দির, সিঁড়ি আছে ওঠবাব। খুব পুরোনো মন্দির, যদিও তীর্থ হিশেবে নাম করতে পারেনি।

চাবটের কিছু আগেই আমরা বেরোলাম। আমবা মানে মানবিকাও। তাঁর তুষ্টির জন্য চকোলেট কিনে নেয়া হ'লো মক্ষিবানির হাতব্যাগ ভর্তি ক'বে। আকাশ আবাব মেঘলা হ'য়ে আসছিলো, আমরাও গাড়িতে উঠলাম কি বৃষ্টি নামলো। প্রকৃতি যেন পণ করছে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা কববে। কিন্তু আমবাও হাব মানছি না ; বৃষ্টিব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মোটবযান চলেছে। এলুম শহব ছাড়িয়ে ; ছোটো-ছোটো পাহাড় আব খেত, পাহাড় আব জঙ্গল ; পথ ফুবিয়ে আসছে আব বৃষ্টির তোড়ও বাড়ছে। সিমাচলমেব কাছাকাছি এসে বৃষ্টিতে তো চারদিক অন্ধকার। উদ্দাম বর্ষা নেমেছে এই দক্ষিণেব দেশে, আকাশে উড়েছে শীত-মনসুনের নিশেন। খবব এসেছে, মান্দ্রাজেব দিকে চলেছে সাইক্লোনেব লীলা, এখানে তবু তো ভালো। রা--বাবু বললেন, 'ঐ দেখুন সিমাচলম, ঐ পাহাড়ে আমরা উঠবো।' ঘোর বৃষ্টিতে কিছুই দেখতে পেলুম না, অত বড়ো আস্ত পাহাড়টাই যেন মুছে গেছে। 'এই বৃষ্টিতে উঠবেন?' 'বৃষ্টি থেমে যাবে,' আশ্বাস দিলেন রা—বাবু।

আর সত্যিও, পাহাড়ের পায়ের কাছে যেই পৌঁছনো, অমনি থেমে গেলো বৃষ্টি। রা—বাবুর ভবিষ্যৎ-কথনের শক্তি আছে, বলতে হবে। পাহাড়ের তলায় গ্রাম, ঘর বাড়ি বাজার বসতি লোকজন। রা—বাবুর আরদালি আদেশ পাওয়ামাত্র গোটা তিনেক ছাতা সংগ্রহ ক'রে ফেললো এ-সব পারে ওরা। একজন পরিচারিকাও পাওয়া গেলো, মানবিকাকে কোলে ক'রে নিয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে। লম্বা ছিপছিপে যুবতী, আঁটোসাটো নিটোল শরীর, মুখে হাসি লেগেই আছে। শক্ত ক'রে কোমরে কাপড় জড়িয়ে মানবিকাকে কোলে নিয়ে খেলার মতো পাহাড়ে উঠে গেলো আবার নেমে এলো। তার সাবলীলতার তারিফ না-ক'রে পারলুম না।

সিমাচলম বারো শো ফুট উঁচু, ন-শোর কিছু বেশি সিঁড়ি আছে। ভিজিয়ানাগ্রামের রাজা করিয়ে দিয়েছেন। মস্ত চওড়া সিঁড়ি, পাঁচটা ক'রে ধাপের পরেই খানিকটা সমতল জায়গা, এমনি ক'রে চলেছে। যত আমরা উঠছি, ততই ঐ উঁচু পর্যন্ত সরু-হ'য়ে-যাওয়া সারি-সারি সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। ওখানে শেষ নয়, ওখানে বেঁকে গিয়ে আবার আরম্ভ হয়েছে। মাঝে-মাঝে বিশ্রামের জন্য দাঁড়াচ্ছি আমরা - দাঁড়াতে হচ্ছে। ব্যানার্জিদের দু-ভাইয়েরই চমৎকার জোয়ান চেহারা, কিন্তু তাঁরাও হাঁপিয়ে পড়ছেন, অতএব আমার বিষয়ে আর কথা কী। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে না শুধু মক্ষিরানি। ক্ষীণ এবং হালকা শরীর নিয়ে সে আমাদের লজ্জা দিয়ে পিছনে ফেলে উঠে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, পাহাড়ে চড়া ব্যাপারে মক্ষিরানিরই জিৎ।

তখনকার মতোও কোনো কষ্ট হয়নি, পরেও গা-ব্যথা পা-ব্যথা হয়নি একমাত্র তারই। ক্ষীণ শরীর দেখলেই যাঁরা মেকি করুণার ফোয়ারা ছুটিয়ে দেন, এ-ব্যাপারটা তাঁদের নজরে আনতে ইচ্ছা করি।

প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে উঠেছি এমন সময় একটা ঝমঝম শোঁ-শোঁ শব্দ কানে এলো। যেন রাত্রির দিগন্ত চিরে ট্রেন ছুটেছে। একটু পরেই যে-দৃশ্য দেখলুম, সেটা দেখবার মতো বটে। জল, জল। পাহাড়ের মাথা থেকে বৃষ্টির জলের ঢল নেমেছে; বোধহয় চারশো-পাঁচশো সিঁড়ি বেয়ে ভেঙে-ভেঙে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে নামছে উচ্ছ্বসিত ফেনায় আর ঝমাঝম শব্দে। এখানে এসেই পাশের নালা দিয়ে গড়িয়ে চ'লে যাচ্ছে খরস্রোতে নিচে। নালার শেষ এখানেই; তাই এর পর থেকে সবগুলো সিঁড়ি মিলিয়ে ঠিক জলপ্রপাতের মতো দেখতে হয়েছে। সিঁড়ি দেখা যায় না, ফেনোচ্ছল দ্রুত জল দামামা বাজিয়ে নামছে। এই তোড় ঠেলে উঠতে হবে নাকি? মনে-মনে ভীত বোধ করলুম। হবেই উঠতে। সকলের জুতো খুলে ওখানে রাখা হ'লো, ব্যানার্জিদের এক অনুচর রইলো পাহারায়। তারপর শুরু হ'লো জলারোহণ। আস্তে পা ফেলে-ফেলে উঠছি। যত উঠছি, আরো উপরে দেখা যাচ্ছে বিঘূর্ণিত শাদা ফেনা। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর, কিন্তু সমস্ত মন নিরাপদে পা ফেলতেই নিয়োজিত, সৌন্দর্য দেখি কী দিয়ে?

এখন আমাদের সাহস বেড়েছে, তাড়াতাড়ি উঠছি।

পরোয়া নেই শুধু ঐ মেয়েটার, মানবিকাকে শিথিল ভঙ্গিতে কাঁখে ঝুলিয়ে ছপাছপ শব্দে উঠছে। আমরাই বার-বার ওকে সাবধান করছি, একটু পর-পরই দেখছি তাকিয়ে। কিন্তু ও ঠিক আসছে। ওর পক্ষে বিশেষ-কিছুই নয় এটা; আমার পক্ষে এই কাহিনী লেখা যতটুকু, তাও নয়। শরীরের কাজে অভ্যাসটাই বড়ো সহায়; বুদ্ধির কাজে অভ্যাস তো চাই-ই, তবু হাজার অভ্যাসেও কাজটা ঠিক সহজ হ'তে চায় না। কুলিরা প্রকাণ্ড দেড়মনি বোঝা মাথায় ক'রে নিয়ে যায়, দেখে অবাক লাগে। ওরা যে এক-একজন পালোয়ান তা তো নয়, ঐ ভারবহনটাই বিশেষভাবে অভ্যাস করেছে ব'লে সহজে পারে। কেননা একটা দেড়মনি বোঝার সঙ্গে আর-একটা দেড়মনি বোঝার কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু যে-লোক পঞ্চাশটা গল্প লিখেছে, একান্ন নম্বরের গল্পটা লিখতে তার কোনো কষ্ট হবে না তা নয়। বুদ্ধির কাজে প্রত্যেক বারেই নতুন সমস্যা; নতুন ক'রেই আক্রমণ করতে হয় প্রত্যেক বার।

জলপ্রপাত পার হ'য়ে উঠে এসেছি। এখন মাটির পথ এঁকে-বেঁকে চলেছে ছমছমে বুড়ো গাছের তলা দিয়ে, একটা বস্তির ভিতর দিয়ে, দুটো-একটা দোকানের পাশ দিয়ে একেবারে মন্দিরের দরজায়। তখন ঠিক সন্ধ্যা। মন্দিরের লোক মশাল জ্বালিয়ে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলো। ছোট্ট মন্দির; অতি পুরোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কলাকৌশলের দিক থেকে আমার অপণ্ডিত চোখে অন্তত অসাধারণ লাগলো না। প্রধান মূর্তি

নরসিংহের, অনিবার্য লক্ষ্মীদেবী আছেন, তাঁর থালায় সবচেয়ে বেশি পয়সা পড়ে। সত্যি বলতে, তীব্র চামচিকের গন্ধ আর প্রাঙ্গণের পাথরের পিচ্ছিলতার বিপদ—এ-ছাড়া মন্দিরের বিশেষ-কিছু লক্ষ্য করতে পারলুম না। চারদিকে কী আর দেখবো, অন্ধকার হ'য়ে গেছে। এত কষ্ট ক'রে যে উঠলুম, তার মধ্যে ওঠাটাই শুধু লাভ হ'লো। এইবার অবতরণ।

অন্ধকার পথ। আকাশ মেঘে চাপা, নয়তো এতক্ষণে চাঁদের আলো ফুটতো। আমাদের ছোট্ট টর্চের আলো নিতান্তই পরিহাসের মতো। কিন্তু ভয় নেই; রাজার অতিথিশালার এক পরিচারক আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে পেট্রোম্যাক্স নিয়ে। সবুজ উজ্জ্বলতায় পথ দেখে-দেখে নিশ্চিন্তে চলেছি আমরা। এই ভদ্রতা, এই যত্ন, সে কি আমাদেরই জন্য? তা কি কল্পনাও করা যায়? সাক্ষাৎ রাজশক্তি চলেছে আমাদের সঙ্গে, তার প্রতাপ আমরাও বেশ পুইয়ে নিচ্ছি। পৌঁছলুম আবার জলপ্রপাতে; তেমনি তোড়েই জল নামছে উচ্ছ্বাসের কলরোলে; উঠতে তো ঠিক পেরেছিলুম, এখন আবার নতুন ক'রে ভয় হ'লো। মানুষের জীবন-লীলায় যা-ই হোক, সোপানশ্রেণীতে কিন্তু ওঠার চাইতে নামাটাই বেশি শক্ত। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে পা পিছলোবে, আর কোনোরকমে একবার পদস্খলন ঘটলে এই জলের ধাক্কায় সিঁড়িতে ঠোকর খেতে-খেতে কোথায় যে গিয়ে ঠেকবো, ভাবতেও দম আটকে আসে। পেট্রোম্যাক্সের অস্থির আলোয় দেখা যাচ্ছে আমাদের পায়ের উপরে ফেনার

নৃত্য ; মানবিকার বাহনটিকে কাছে-কাছে রেখে আমরা আস্তে-আস্তে নামছি।

বিপদের বেড়া পাব হ'য়ে এসেছি, আর জল নেই। ভিজে পায়ে জুতো প'রে নিয়ে আবার যাত্রা। নিচে পৌঁছিয়ে রা—বাবুদের সঙ্গে যেতে হ'লো রাজার অতিথিশালায় ;—মক্ষিরানি রইলো গাড়িতে। সেখানে কিছু পরশক্তিবিচ্ছুরিত তির্যক আপ্যায়ন ভোগ করলুম। সেটা আর বেশি কথা কী-এ-যাত্রায় যে আস্ত শরীরে আবাব সমতলে নেমে আসতে পেরেছি তা যে রা—বাবুরই রাজপ্রভাবে, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে ? এমন যদি হ'তো—তা-ই হওয়াই সম্ভব ছিলো- যে আমরা একাই চ'লে এলুম সিমাচলমে এবং উপরে পৌঁছতে সন্ধে হ'য়ে গেলো, তাহ'লে···সে-দুর্ঘটনার কথা এখন আর কল্পনা ক'রেও কাজ নেই। মন্দিরেব দেবতা কি মন্দিরলগ্ন অজ্ঞাতগোত্র মানুষ আমাদেব সাহায্যে কড়ে আঙুলটিও নাড়তো না এ-কথা নিশ্চয়ই ধ'রে নেয়া যায় ? তাহ'লে বাকি থাকলো অন্ধকারে ঐ জলপ্রপাত পার হওয়া, আর নয়তো সিমাচলমের চূড়াতেই রাত্রিযাপন। এর মধ্যে কোনোটাই ঠিক হৃদয়গ্রাহী প্রস্তাব ব'লে মনে হয় না। এর শিক্ষাটা মনে-মনে টুকে রাখলুম ; ভবিষ্যতে যদি কাজে লাগে।

ফিরতি-পথে গাড়ি চলেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে জ্যোছনা ফুটেছে ; দেখে মনে হচ্ছে আকাশ এইবার সত্যি-সত্যি পরিষ্কার হবে। কাল থেকে হয়তো ওয়াল্টেয়ারে আলোর বন্যা, সঙিনের মতো ঝলসাবে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে রোদের রেখা, রাশি রাশি লোনা জলের উপর দিয়ে ব'য়ে এসে গায়ের উপব

ঝাঁপিয়ে পড়বে হাওয়া, আর রাত্রে চাঁদের নিচে সমুদ্র তার স্বপ্নের দিগন্ত মেলে ধরবে। কাল থেকে ওয়াল্টায়ার হয়তো অপরূপ।··কিন্তু কালই আমরা চ'লে যাচ্ছি। ব্যানার্জিরা যাচ্ছেন, সেই ব্যারিস্টর ভদ্রলোকও যাচ্ছেন; ফিরোজ ম্যানশন্স-এ স্নান না-ক'রে, স্পিরিট-ল্যাম্পে দায়-সারা রান্না-খাওয়া ক'রে, জিনিশ চুরির ভয়ে সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত হ'য়ে, আমাদেরও আর থাকার ইচ্ছে নেই। পাথেয় তলায় এসে ঠেকলেও আরো কয়েকটা দিন কাটাতে যে না পারতুম তা নয়। কিন্তু ঐ বঙ্কনাদির বিঘ্নময়তা আর যেন সহ্য হচ্ছে না। সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে তো থাকা যায় না; বরং তাতে ঘন-ঘন খিদে পায়; এবং প্রত্যেক বার স্পিরিট-ল্যাম্প ধরিয়ে নিজেদেরই ভোজ্য রচনা করতে হ'লে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো সময়ও থাকে না, মেজাজও থাকে না। সার কথা তাহ'লে শুনে রাখুন আপনারা, যে জঠরাঞ্চল শোভনরকম শান্ত না-থাকলে হৃদয় এবং মস্তিষ্কের কলকব্জাও বিগড়ে যায় হোক প্রকৃতি, হোক আর্ট শূন্যোদরে কোনোটাই ঠিক জমে না।

না, আমরাও কাল যাচ্ছি, এবং যাচ্ছি ভাবতে ভালোই লাগছে আমাদের। ফেরার পথে ব্যানার্জিরা স্টেশনে থামলেন, বর্থ রিজর্ভ করবেন তাঁরা। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালুম। এতক্ষণে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে; লক্ষ্মীপূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদের নিচে পৃথিবী যেন রূপান্তরিত। ভারি আশ্চর্য লাগলো। খানিক আগেই

এত যে মেঘবৃষ্টি হ'য়ে গেলো, জলের ঢেউ ভেঙে আমরা পাহাড়ে উঠলুম, আমাদের সব পরিশ্রম আর দুর্ভাবনা—তার কিছুরই এখন চিহ্নমাত্র নেই, সব মুছে গেছে এই অজস্র উজ্জ্বল জ্যোছনায়। চপল সত্যি প্রকৃতি। আমাদের সঙ্গে ছোটোখাটো একটি পরিহাস হ'লো; চ'লে যাচ্ছি কিনা, তাই আজ এত দয়া। রসিকতাটা খুব সুরুচিসংগত নয়—অন্তত আমি তা-ই মনে করি।

স্টেশনে কিছু দুধ কিনলুম, মানবিকাকে খাওয়ানো হ'লো, তার মাতাও কিঞ্চিৎ সেবন করলেন। তারপর ব্যানার্জিরা আমাদের আহ্বান করলেন আমাদের সেই দুঃখের রাত ভোর-করা রিফ্রেশমেণ্টরুমে। কফি। মক্ষিরানির জন্য দুঃখ হয়, সে কফি খায় না। আমিও শখ ক'রে মাঝে-মাঝে খাই মাত্র, কিন্তু সেদিন ওখানে যা খেলুম অমন অমৃততুল্য পানীয় কখনো চেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। এমন সৌরভ, এমন স্বাদ, আর এমন গনগনে গরম! কয়েক ঢোক দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রেই যেন সমস্ত স্যাৎসেঁতে ক্লান্তি ঝেঁটিয়ে খেদিয়ে দিলে। এই কফির পেয়ালা শিগগির ভুলবো না।

ফিরোজ ম্যানশন্স-এ ফিরে এসে মক্ষিরানির দয়ায় আবার কফি, চা দুই-ই পেলাম। শ—বাবু আমাদের ঘরে ব'সে কফি আর সিগারেট সহযোগে গল্প করলেন নানারকম। দাদার সামনে তিনি সিগারেট খান না; প্রায়ই তাই আমার সঙ্গ খোঁজেন। কাল বেলা দেড়টায় গাড়ি; সকালে উঠেই তাঁদের সঙ্গে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়টা দেখে আসবো, এই ঠিক হয়েছে। আজকের ট্যাক্সিটাই আসবে, এবং ইউনিভার্সিটি

দেখে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে এই ট্যাক্সি চ'ড়েই স্টেশনে যাবো তাও ঠিক হ'য়ে আছে। ধন্যবাদ এঁদের, অনেক হাঙ্গামা আমাদের বেঁচে গেলো।

একটু আগে হ'লো কী, স্টেশনের বাইরে তো দাঁড়িয়ে আছি, ব্যানার্জিরা গেছেন ভিতরে, মক্ষিরানি গাড়িব মধ্যে ব'সে। এমন সময় একজন লোক কাছে এসে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো। দেখি, পরশু সকালবেলাব আমাদেব সেই কুলি। খুব খুশি হলাম। খোঁকি কাঁহা? খোঁকি আছে ভিতরে, ঠিক আছে। উঁকি দিয়ে খোঁকিকে একটু দেখে নিয়ে বললো, 'কোথাকার দুধ খাচ্ছে?' 'ঐ হিন্দু স্টলের।' 'ও তো ভালো দুধ নয়।' 'ভালো দুধ কোথায় পাবো?' 'রিফ্রেশমেণ্টরুমে।' ওকে জানালুম যে খোঁজ নিয়ে এসেছি, ওরা বললে আর-একটু পরে দিতে পারবে। তা-ই নাকি? কুলি গেলো দৌড়ে, চমৎকার এক পেয়ালা গরম দুধ আনিয়ে দিলো। তারপর এনে দিলে পান কিনে। কবে যাচ্ছো তোমবা? কাল। কাল মেলমে? আমি ঠিক থাকবো, আমাকে নিয়ো কিন্তু।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরের দিন স্টেশনে আমাদের এই কুলি-বন্ধুর দেখা পেলুম না।

ফিরতি পথ

যে-গাড়িতে আমরা চলেছি সেটা মান্দ্রাজ মেল নয়, যদিও সেই সময় ধ'রেই চলেছে। দক্ষিণ উপকূলে যে-সাইক্লোন হ'য়ে গেছে, তার ফলে ডাকগাড়ি আজ পাঁচ ঘণ্টা বিলম্বিত, রোজই হচ্ছে এ-রকম। এ-গাড়িখানা ওয়াল্ট্যায়ার থেকেই রওনা হ'লো। বোধহয় সেইজন্যই এত আরামে যেতে পারছি। মস্ত ইণ্টার ক্লাশ কামরায় মাত্রই চার-পাঁচজন যাত্রী উঠেছে : আমরা পুরো ছুটো বেঞ্চি দখল ক'রে, বিছানা পেতে, টুকরো জিনিশ এবং নিজেদের হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত। পথে অনেক লোক উঠলো নামলো ; ওয়াল্ট্যায়ার থেকে একেবারে কলকাতায় যানেওয়ালা আমরাই শুধু ছিলাম। নিচু কেলাশের ভ্রমণে এমন সৌভাগ্য বড়ো হয় না।

রোদে উজ্জ্বল সুন্দর দিনটি। আসবার সময় এ-পথের কিছুই দেখতে পাইনি ; এ-গাড়িটা দিনের বেলায় না-হ'লে বড়ো ঠ'কে যেতুম। চলেছে পাহাড়ের সারি ছু-দিকে। একসঙ্গে যে ছু-দিকেই তাকানো যায় না তারই জন্য আপশোষ হয়। মাইলের পর মাইল, মিনিটের পর মিনিট, কাছে ও দূরে, প্রান্তরে ও দিগন্তে, কেবল পাহাড়, পাহাড়। আঁকাবাঁকা কত রেখায়, কত অদ্ভুত ভাস্কর্যের ভঙ্গিতে, কত আশ্চর্য বিচিত্র ছন্দে চলেছে এই পাষাণের মিছিল। ছেলেবেলায় ভূগোলে যাকে ঈস্টর্ন ঘাটস ব'লে পড়েছি, এবং ম্যাপে যাকে দেখেছি গাঢ় ব্রাউন রঙের একটা বিছের মতো,

এ যে তারই লেজের দিকটা সে-কথা ভাবতে রোমাঞ্চিত হলুম। আমরা অনবচ্ছিন্ন সমতল দেশের লোক, বড়ো-বড়ো নদীর দেশের, একটা ঢিপির মতো পাহাড় দেখলেও আমরা হাঁ ক'রে থাকি। আর এখানে কিনা দু-শো মাইল ধ'রে পাহাড় ছাড়া কিছুই নেই! এক-একটা এত কাছে যে মনে হয় লাগলো বুঝি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা—কিন্তু না, আমাদের গাড়ি ঠিক পাশ কাটিয়ে গেছে, ঐ ছাখো ওকে, ঘাড় বাঁকিয়ে রোদ্দুর লাগাচ্ছে পিঠে। আব ছাখো ওখানে ওদেরই একজনের ঢালু গায়ের উপর হালকা একখানা মেঘের ছায়া কেমন আলগোছে শুয়েছে, ও-ছায়া যতক্ষণে স'রে যাবে, ততক্ষণে আমরা বোধহয় ঐ শিং-উঁচোনো দানোব কাছে গিয়ে পড়েছি। আচ্ছা, কতক্ষণ চলবে ওরা? যত যাচ্ছি ততই যে আরো আসছে। প্রতি মুহূর্তে আমাদের ভয় এই বুঝি ফুরিয়ে গেলো; কিন্তু দেখা গেলো, প্রকৃতির প্রাচুর্যের সত্যি যেন সীমা নেই পলে-পলে দেখা দিচ্ছে ওরা, অন্তহীন, ক্লান্তিহীন। মনের ভিতরটায় আমাদের কেমন অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগলো। যেন নির্দিষ্ট খানিকটা তামাশা দেখার জন্য টিকিট কিনেছি, দেখানেওলা ভুল ক'রে আমাদের ঢের বেশি দেখিয়ে দিচ্ছে, পাছে ধরা প'ড়ে যাই সেই ভয়ে প্রাণ খুলে বাহবা দিতে পারছি না।

আজকের আকাশে একটি স্নিগ্ধ নীল আভা লেগেছে। আর তাছাড়া, এখন আর আমাদের কোনো দুর্ভাবনা, কোনো উৎকণ্ঠা নেই; ইচ্ছেমতো আরামে শুয়ে-ব'সে মনের

ভিতরটা অসাধারণ খুশি লাগছে। কিন্তু খানিক বাদেই খুশিতে একটু চিড় ধরলো। ভিজিয়ানাগ্রাম স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে, এখানে রিফ্রেশমেণ্টরুম আছে, চা নিলে তো হয়। মক্ষিরানি বললে, এখনই! বাঃ, শোনো কথা! বেরোবার আগে একটুখানি ভাত মাছের ঝোল দু-জনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কোনোরকমে গলাধঃকরণ ক'রে নিয়েছিলুম, তাকে কি খাওয়া বলে! আমাদের যকৃৎ কি এতদূর বিকৃত হয়েছে যে সেটাই এখনো ব'সে আছে পাকস্থলীতে! তাছাড়া এইমাত্র আমাদের নাকের তলা দিয়ে এক উর্দি-আঁটা খানশামা চমৎকার ট্রে সাজিয়ে কোন ভাগ্যবানের কামরায় যেন নিয়ে গেলো, এ-দৃশ্য কি চোখে দেখে সহ্য করা যায়! সুতরাং আমি নামি গাড়ি থেকে, রি-রুতে গিয়ে চায়ের ফরমাশ করি। ওরা মাথা নেড়ে বলে, সময় হবে না। তার মানে? ঐ যে একবার নিয়ে গেলে? আগের অর্ডার ছিলো।

নিতান্ত নিষ্প্রভ হ'য়ে ফিরে এসে বসলুম। বোঝা গেলো ব্যাপার; এ-গাড়িতে রেস্তোরাঁ-কার নেই, আগে গার্ডকে বললে তিনি পরের স্টেশনে তার ক'রে দেবেন, সেখানে গিয়ে মিলবে খানাপিনা। হায়রে, আগে যদি জানতুম! সামান্য এক পেয়ালা চায়ের জন্য এই সভ্য দেশের রেলপথে এত হাঙ্গামা পোয়াতে হয়, আমি তো এটাকে রীতিমতো কলঙ্ক মনে করি। যাকগে, আপাতত রাগ হজম ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকা ভিন্ন উপায় নেই। এর পরের রিফ্রেশমেণ্টরুম বহরমপুরে, সেখানে পৌঁছতে সন্ধ্যা। ঘণ্টা দেড়েক পরে একটা স্টেশন আসবে, সেখানে গার্ডকে ব'লে

দিতে হবে। সন্ধ্যার আগে কোনো কিছুরই আশা নেই। বুদ্ধি ক'রে ফ্লাস্কেও যদি চা আনতুম!

এবার আমাদের লম্বা প্লো, ফূর্তিসে গাড়ি দিয়েছে দৌড়। ঝকাঝক, ঝকাঝক: এই ছন্দটা কানে লাগতে-লাগতে যেন মগজের মধ্যে গাঁথা হ'য়ে যায়। শরীরে লাগছে ঝাকুনি, জিনিশে লাগছে দোলা; থেকে-থেকে লাইন বেঁকে যাচ্ছে, আর সমস্ত কামরাটা একদিকে হেলছে। ঝকঝক-ঝকাঝক: মাইলের পর মাইল, মাঠের পর মাঠ, পাহাড়ের পর পাহাড় পার হ'য়ে চলেছি আমরা, বেগের হাওয়ায় শোঁ ক'রে উড়ে যাচ্ছে কুঁড়েঘর ঝোপঝাড় গাছপালা। রইলো নদীনালা পিছনে প'ড়ে, রইলো ঐ লাল মাটির রাস্তা, তার আশে-পাশে না জানি কত পুঞ্জ-পুঞ্জ জীবন। আমরা চলেছি দিগন্তকে ধাওয়া ক'রে; আকাশ ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে পাখির ঝাকের মতো; আমাদের চোখের সামনে আস্ত গোল পৃথিবীটা দ্রুত ধাবমান অসংখ্য টুকরো ছবিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কী আশ্চর্য জিনিশ এই রেলগাড়ি! সে-যে আমাদের শুধু এক ঠিকানা থেকে অন্য ঠিকানায় নিয়ে যায় তা তো নয়, চেতনার এক স্তর থেকে অন্য স্তরেও বদলি করে; স্থানকালের দাসত্ব থেকে আমরা খানিকটা যেন মুক্ত হই--স্থান যেন তরল স্রোতে অবিরল গ'লে যায়, আর কাল স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে গতির বিদ্যুৎময় মুহূর্তে। ভাবো একবার, কী আশ্চর্য জিনিশ এই রেলগাড়ি, কী আশ্চর্য তার অসহিষ্ণু দুঃসাহস, তার বাষ্পীয় রক্তের

দারুণ উত্তাপ আমাদের শরীরেও কি সংক্রমিত হয় না? তাকে কি ভাবতে পারো নিছক একটা নিষ্প্রাণ, জড় যন্ত্র ব'লে, বলো, তা কি পারো ভাবতে, যখন সে চলতে থাকে হু-হু ক'রে অবিশ্রাম, অফুরন্ত পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে! পৃথিবীর বুকের ভিতর অন্ধকার সুরঙ্গে-সুরঙ্গে ও জাগিয়েছে প্রতিধ্বনি, ঘুমোনো হাওয়াকে জাগিয়েছে ও, নির্ভয়, ও নিস্পৃহ, ও বীর, পিছনে কোনো টান নেই, সামনে কোনো বাধা নেই, কোনো কিছুর উপরেই মোহ নেই; দুর্গমকে ও ছিঁড়েছে, দূরকে ও কেড়ে এনেছে, কত জনতা, কত নিরালা, কত বিচিত্র, সুন্দর ও ভয়ংকরকে ঝাপটার পর ঝাপটায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, নিজেকেই নিজে ছাড়িয়ে যাবে এই যেন ওব পণ।

এদিকে আমরা ব'সে আছি আরামে পা ছড়িয়ে; গল্প করছি, সিগারেট খাচ্ছি, দেখছি। দিনের বেলায় রেলগাড়িতে সত্যি ভারি ভালো লাগে। আশ্চর্য মনে হয়, এই যে উজ্জ্বল আলোর ভিতর দিয়ে দ্রুত গতি, এই যে ক্ষণে-ক্ষণে দৃশ্যপটের পরিবর্তন—সত্যি কি এতই রূপ এই পৃথিবীর? এঞ্জিনের যে-প্রচণ্ড বেগে চাকার তালে-তালে আমাদের শরীর ঝাঁকাচ্ছে—কী অবাধ মুক্তি তাতে, খোলা, চারদিক খোলা, ছাড়া পেয়েছি আমরা, ছুটি পেয়েছি; এই নির্জন নির্লজ্জ পৃথিবী থেকে, এই শূন্য পাহাড়ের দিগন্তসীমা থেকে, একটি উদার স্বাধীনতার হাওয়া এসে লাগছে আমাদেরও শরীরে মনে। ঠিক এই অনুভূতি আর কোনোখানেই হয় না, আর

কিছুতেই হয় না।…তারপর এক সময় শেষ ইস্টেশনের প্ল্যাটফরমে এই এঞ্জিন এসে চুপ ক'রে দাঁড়াবে যেন খাঁচায় পোষা বাঘ; দয়া হয় তখন তাকে দেখলে। আর আমরাও ঢুকবো আমাদের নিয়মে বাঁধা জীবনযাপনের খাঁচায়— কিন্তু আমাদের দয়া করবার কেউ নেই।

এতক্ষণে গাড়ি থামলো। স্টেশনটা এমনিতে মহৎ নয়, তবে জল নেবার জন্য গাড়ি দশ মিনিট দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি গেলুম গার্ডের গাড়িতে: বহরমপুরে আমাদের চাই দুটো চা, চারখানা কটলেট, আর দুই থালা ভাত আর মুর্গির ঝোল। এই প্রশংসনীয় সৎকর্মটি সম্পন্ন ক'রে কামরায় যখন ফিরেছি, মক্ষিরানি বললো, 'চা আর ভাত কি এক সঙ্গেই খাবো নাকি?' মেনে নিতে হ'লো এই যুক্তির সারবত্তা, ভ্রমসংশোধন করতে আবার ছুটলুম গার্ডের গাড়িতে। ভাত আমরা চাই খুরদা রোডে। কিন্তু গার্ডসাহেব মাথা নাড়লেন, তার করা হ'য়ে গেছে, এখন আর বদলানো যাবে না। নতশিরে ফিরে গেলো পুরুষ। মক্ষিরানি বললো, 'তা আর কী হয়েছে—, ভাত-মাংস বাটিতে তুলে রাখলেই হবে, সঙ্গে তো সব আছেই।' সহজেই হ'য়ে গেলো আমার পক্ষে সুকঠিন সমস্যার সমাধান।

কিন্তু এখন আর অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। সারাটা দিন বিনা চায়ে কেটে গেলো। কখন পৌঁছবে বহরমপুর,

এখন শুধু তা-ই জপছি মনে-মনে। ঘন-ঘন টাইমটেবিল দেখছি, তাতে যদি সময়টাকে কিছু এগিয়ে আনা যায়। বেলা প'ড়ে এলো। ট্রেন ছুটেছে সন্ধ্যার দিকে—এবং আমাদের পক্ষে যেটা বেশি দরকারি, বহরমপুরের দিকে। আলো ক'মে এলো বাইরে। আকাশে একটি ধূসর মেঘেব স্তর, তার পিছনে সূর্য অস্ত গেলো। ঘন নীল হ'য়ে উঠলো ঢেউ-খেলানো শিং-উঁচোনো, সার-বাঁধা লম্বা পাহাড়। একেবারে আকাশের গা-লাগা, ঠিক যেন থিয়েটারের পট। নামলো অন্ধকার। রেলগাড়ির ভিতরে ব'সে এই সন্ধ্যার মুহূর্তটি বড়ো করুণ।

তারপর সত্যি-সত্যি এক সময় বহরমপুর এলো। আমি আগে থেকেই গলা বাড়িয়ে আছি, জঠরের কাৎরানি প্রায় অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। প্ল্যাটফবমে অনেকগুলো খানশামা ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে, গাড়ি দাঁড়াবাব সঙ্গে-সঙ্গে নানা কামরার দিকে ধাবিত হ'লো তারা। বলতে এখনো খুব খুশি লাগছে-আমাদেরটাতেও এলো একজন। যে-রকম দ্রুতবেগে আমি সেই চা আর উৎকৃষ্ট কটলেট অদৃশ্য ক'রে ফেললুম, সন্দেহ করি সেটা খুব সুদৃশ্য হয়নি, ভদ্র সমাজে ওটা অনুমোদিত নয়। এদিকে মক্ষিরানির অঙ্গুলিচালনা অতিশয় পরিশীলিত, কিন্তু এটা না-বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হবে না যে ঈষন্মাত্র মুখব্যাদন এবং সুশোভন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খণ্ডের মন্থর চর্বণেব ফলে শেষ পর্যন্ত খাদ্য যতটা অন্তর্হিত হয়েছিলো, তার পরিমাণ উপেক্ষণীয় নয়।

ভাত মাংস তোলা হ'লো বাটিতে। পরের স্টেশনে ওরা

থালা-বাসন নিয়ে গেলো। মানবিকা ঘুমোলেন, মক্ষিরানিও গায়ে চাদর টেনে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ব'সে রইলুম জানলার ধারে। বাইরে চাঁদ উঠেছে। আমাদের সারাদিনের সঙ্গী পর্বতমালাকে এতক্ষণে ছাড়িয়ে এসেছি আমরা, এখন শুধু ছাড়া-ছাড়া ছোটো পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আপাদমস্তক ঘন উদ্ভিদে সবুজ। এতে বোঝা যায়, উড়িষ্যায় ঢুকেছি। পরিচিত পথ দিয়ে ফিরে চলেছি অতিপরিচিত দিনযাপনের দিকে। মনটা একটু-একটু খারাপ লাগছে।

আবার রম্ভা, যেখানে এর আগের বারে ক্ষণিকের স্বর্গসুখ আমরা ছিনিয়েছিলুম। আবার গাড়ি চলেছে চিল্কা হ্রদের প্রান্ত দিয়ে ঘেঁষে। আলোয় চিকচিক করছে ধূ-ধূ স্তব্ধ জল, দিগন্তসীমা আবছা হ'য়ে মিলিয়ে গেছে। কেমন একটা ঝাঁ-ঝাঁ শূন্যতা জলের উপর, যেন হৃদয়হীন অনির্বচনীয় শান্তি। মাঝে-মাঝে দ্বীপগুলো দেখা যাচ্ছে, যেন কালো-কালো জলজন্তু চাঁদের নিচে চুপে-চুপে উঠে এসেছে। মক্ষিরানিকে বার-বার ঠেলা দিয়ে ডাকলুম দেখার জন্য ; ক্লান্ত হ'য়ে গভীর ঘুমিয়েছে, উঠলো না। আরো চিল্কা চলেছে, আরো জল, আরো দ্বীপ, আরো জ্যোছনা। আবার মক্ষিরানিকে তুলতে চেষ্টা করলুম, এবারে বেশ রূঢ়ভাবেই ঠেলা দিয়ে। তবু ভাঙলো না ঘুম। সে যখন জাগলো, চিল্কা ছাড়িয়ে খুরদা রোড ধরো-ধরো। তাহ'লে---তাহ'লে আর-কিছু নেই, শুধু রাত্রি, ফুরিয়ে-আসা পথ, শুধু ঘুম। ভাত বের করো, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি।

ভোরবেলা কলকাতা।